কিশোরপ্রিয় গ্রন্থমালা

কুণ্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার
www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আজগুবি গল্প

অদ্রীশ বর্ধন
সম্পাদিত

ওরিয়েন্ট লংম্যান

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
ISBN 0 86131 969 9

রেজিস্টার্ড অফিস :
৩-৬-২৭২, হিমায়াৎনগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস :
কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১
৩-৬-২৭২, হিমায়াৎনগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯
বিড়লা মন্দির রোড, পাটনা ৮০০ ০০৪
এস্. সি. গোস্বামী রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১
'পাতিয়ালা হাউস', ১৬এ অশোক মার্গ, লক্ষ্ণৌ ২২৬ ০০১

প্রচ্ছদ : রেসপন্স

প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯

প্রকাশক :
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রক :
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৭০০ ০৫৪

সূচীপত্র

অবিশ্বাস্য

সত্যেনবাবুর শেষ জীবনে আমিই তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলাম। এই বিশালাকায় বৃদ্ধের জীবন সাধারণ বাঙালীর জীবনের চেয়ে যে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়, তাও জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল।

মধুপুরের তাঁর ছোট্ট নির্জন বাংলোবাড়ির বারান্দায় বসে সন্ধ্যার পর তিনি ধীরে ধীরে তাঁর পূর্বজীবনের অনেক কাহিনীই আমায় বলেছিলেন। সে সমস্ত কাহিনী নিয়ে চমৎকার একটা বই লেখা হতে পারে। তাঁকে কতবার সে কথা বলেছি। তিনি একটু ম্লান হাসি হেসে খানিক চুপ করে থেকে বলতেন, 'কিন্তু লোকে বলবে গল্প।'

তাঁর নিজের জীবনের সত্য অভিজ্ঞতাগুলিকে কেউ গল্প বলবে, এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সেই ভয়েই বোধ হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর কাহিনী তিনি আমার কাছেও গোপন করেছিলেন। সাধারণ মানুষের সবজান্তা ভাবকে তিনি সবচেয়ে ভয় ও ঘৃণা করতেন। কতবার তিনি আমার কাছে বলেছেন—'সবচেয়ে মজার কথা এই যে, এত বড় বিস্ময়ের জগতে বাস করেও মানুষ অন্ধ হবার বড়াই করে। তার ছোট্ট জগতের যেটুকু সে জানে তার বাইরেও যে কিছু থাকতে পারে, এ তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও সে বিশ্বাস করবে না।' তারপর প্রায়ই দেখতাম কি যেন একটা বলতে গিয়েও তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করতেন। আমার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও স্নেহ থাকা সত্ত্বেও আমিও হয়ত তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারি, এই সন্দেহ তাঁর যায় নি। তাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনার কথা আমি জানতে পারলাম তাঁর মৃত্যুর পর।

নিচের কাহিনীটি তাঁর নিজের হাতে লেখা। যৌবনে তিনি যখন

সায়ামের জঙ্গল জমা নিয়ে কাঠের কারবার করতেন, ঘটনাটি তখনই ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের ভেতরে যেভাবে, ও যে ভাষায় কাহিনীটি পাই, সেই ভাব ও ভাষা বরাবর বজায় রেখে কাহিনীটি প্রকাশ করলাম। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভার এখন পাঠকের ওপর। তবে, পৃথিবীর আর কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, শেষ পর্যন্ত সেই বিশালকায় ও বিশাল হৃদয় বৃদ্ধের সরলতায় আমার বিশ্বাস অটুট থাকবে।

সত্যেন্দ্রবাবুর কাহিনী

রাত অনেক হয়েছে। পাম্প করা কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোটা মাঝখানে রেখে কেবিনের ভেতর দুধারে দুই ঈজিচেয়ারে আমি আর ডাক্তারবাবু বসে আছি। কেবিনের ভেতর বসে এই গভীর রাত্রেও বাইরের অরণ্যকে ভোলবার উপায় নেই। দূরে কোথা থেকে হায়েনার লোমহর্ষণ হাসি শোনা যাচ্ছে। বিকট সে শব্দ! হায়েনা জানোয়ারটি যে খুব ভীষণ তা নয়, কিন্তু শয়তানের অট্টহাসির মত তার এই ডাকে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত শিউরে ওঠে—শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে উঠতে চায়।

কেবিনের ভেতর সুখসুবিধের বন্দোবস্ত যথাসম্ভব আছে। আমাদের সবচেয়ে নিকটের লোকালয় যে একশ মাইল দূরে এবং একশ মাইলের ভেতর নিরবচ্ছিন্ন বিপদসঙ্কুল দুর্গম জঙ্গল ছাড়া আর কিছু যে নেই, এই কেবিনের ভেতর বসে সে কথা মনে না হবারই কথা! কিন্তু ওই হায়েনার ডাক সেকথা ভাল ভাবেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ডাক্তারবাবু গড়গড়ায় আর একবার টান দিয়ে একটু নড়েচড়ে বসলেন। কাঠুরেদের তাবুতে হঠাৎ একরকম জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখেই তাঁকে সুদূর ব্যাঙ্কক থেকে আনানো হয়েছে। প্রচুর ফি দেবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কোন ডাক্তারকে প্রথমত এই বিপদ সঙ্কুল বনের ভেতর আসতে রাজী করানো যায় নি। শিকারপ্রিয় বলে ইনি

নিজে থেকেই আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। আজ সকালে চারজন অনুচর ও তিনজন মাঝি নিয়ে এসে তিনি নদীপথে পৌঁছেছেন।

হায়েনার ডাক থামতে না থামতেই আমাদের কাঠুরেদের তাঁবুতে হট্টগোল উঠল। এমন রোজই প্রায় ওঠে। বোধহয় ছাগলের খোঁয়াড়ে চিতা পড়েছে। কাঠুরেদের সোরগোলেই বোধহয় চিতা বেচারিকে ছাগমাংসের আশা ত্যাগ করে পলায়ন করতে হল। কিছু-ক্ষণ বাদেই আবার সব নিস্তব্ধ। অরণ্যের এ নিস্তব্ধতাও ভয়ঙ্কর। কেরোসিন গ্যাসের উজ্জ্বল আলোয় আকৃষ্ট হয়ে নানা জাতের পোকা-মাকড় ঘরে এসে জুটেছে, কেবিনের দেওয়ালে একটি টিকটিকি তাদের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত। সেইদিকে চেয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আপনি তো এই জঙ্গলে অনেক দিন বাস করছেন। কেমন—না?'

'হ্যাঁ, তা প্রায় তিন বচ্ছর হবে।'

'এর ভেতরে কোন আশ্চর্য ঘটনা আপনার চোখে পড়েনি?'

'আশ্চর্য তো অনেক ঘটনাকেই বলা যেতে পারে। আপনি কী রকম ঘটনার কথা জানতে চাইছেন?'

'এই ধরুন কোন নতুন রকম জানোয়ার। এ জঙ্গলে তো সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত আপনি ছাড়া কোন সভ্য মানুষ প্রবেশ করেছে কি না সন্দেহ। কতরকম রহস্যই তো এ জঙ্গলে গোপন থাকতে পারে।'

হেসে বললাম, 'তা পারে। কিন্তু আমার চোখে তো পড়েনি। আর বছর একটা সাদা বাঘ মেরেছিলাম। কিন্তু সাদা বাঘ তো নানা জায়গাতেই দেখা যায়। তাছাড়া বিশেষ নতুন কিছু দেখিনি। সেই পুরানো অতি সাধারণ বাঘ, হাতি, অজগর, চিতা আর বুনো মোষ।...'

ডাক্তারবাবুও আমার কথার ধরনে হেসে বললেন, 'কিন্তু এই অরণ্যে মানুষের অজ্ঞাত অনেক রহস্য গোপন থাকতে পারে এ কথাও কি আপনি মানেন না?'

‘তা মানি বইকি !’

ডাক্তারবাবু আবার বললেন, ‘ওই টিকটিকিটার দিকেই চেয়ে দেখুন না। সাধারণ যেসব টিকটিকি দেখেছি, তা থেকে একটু তফাৎ নয় কি ?’

সত্যই টিকটিকিটা একটু ভিন্ন রকমের, পিঠের কাছে যেন তার একটা কুঁজ আছে বলে মনে হল।

বললাম, ‘এটা হয়ত একটা বিশেষ জাতের টিকটিকি। তাই বলে একে রহস্যময় জানোয়ার তো আর বলা যায় না !’

ডাক্তারবাবু বললেন, ‘না।’ তারপর টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে টিকটিকির দিকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘আচ্ছা, ঘা খেলে সব জাতের টিকটিকিরই তো ল্যাজ খসে যায়। দেখা যাক এটারও যায় কিনা !’

কথা শেষ করার পূর্বেই তিনি ছুরিটা ছুঁড়ে মারলেন। দুঃখের বিষয়, ল্যাজে না লেগে ছুরির ফলাটা টিকটিকিটার গলার কাছ দিয়ে তার সামনে ডান পায়ের থাবার ওপর গিয়ে পড়ল। টিকটিকিটা দেওয়াল থেকে মেঝেয় চিত হয়ে পড়ল। ভাবলাম বেচারি বুঝি মারাই গেল। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে একটা কাগজের ওপর তুলে নিলেন। দেখা গেল চোটটা থাবাতেই বেশি লেগেছে। তিনটে আঙুল কাটা গেছে। গলার কাটাটা সামান্য।

বললাম, ‘মরে গেছে নাকি ?’

‘না, বড় কড়া জান এ জাতের। সহজে মরবার নয়। একটু অজ্ঞান হয়েছে মাত্র।’ ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই টিকটিকিটা ধড়মড় করে যেন জেগে উঠে, এক লাফে কাগজের ওপর থেকে নিচে পড়ে, কেবিনের তলার একটা ফাটল দিয়ে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বললাম, ‘আপনার রহস্যময় জানোয়ার যে পালালো !’

ডাক্তারবাবু হাসলেন। কত বড় ভয়ঙ্কর রহস্য আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে জানতাম তখন যদি !

তারপর তিন চার মাস কেটে গেছে।

ডাক্তারবাবুর ওষুধে অধিকাংশ কাঠুরে ভাল হয়ে উঠেছিল। ডাক্তারবাবু চিকিৎসা সেরে তখন চলে গেলেও শিকারের লোভে আবার ফিরে এসেছেন। একজন কাঠুরে খবর দিয়েছে যে নদীর ধারে একটা উঁচু গাছের ওপর থেকে সে ওপারে একপাল বুনো হাতি দেখেছে। তারা এই দিকেই নাকি আসছে। বুনো হাতি মারবার লোভে ডাক্তারবাবু বেশ ভাল ভাবেই এখানে আস্তানা গেড়েছেন।

এত দিনের ভেতর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনাই ঘটে নি। আমাদের রাঁধুনী অন্ধকারে কি একটা জানোয়ার দেখে চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু সে সাধারণত ভীষণ ভয় কাতুরে। জানোয়ারের যে ভয়ঙ্কর বর্ণনা সে দিয়েছে, তাতে কেউ বিশ্বাস করে নি। আর সেটা করাও শক্ত। কারণ একাধারে বাঘ, অজগর, কুমির ও হাতির সমাবেশ এক প্রাণীতে হওয়া সম্ভব নয়।

সকালবেলা কেবিনের সামনে পায়চারি করছিলাম। এক ভেলা বোঝাই কাঠ আগের সন্ধ্যায় নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নদীর প্রবল স্রোতে সে ভেলা এতক্ষণ নিশ্চয়ই বহুদূরে চলে গেছে। মনটা হালকা বোধ হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু তাঁর রাইফেলটা পরিষ্কার করছিলেন, হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আমাদের চীনে রাঁধুনি এসে হাজির।

প্রথমে সে তো কথা কইতেই পারে না। খালি হাঁফায়। অনেকক্ষণ বাদে দম নিয়ে অসংলগ্নভাবে যা বললে তার অর্থ এই যে, আমাদের ছাগলের খোঁয়াড় ভেঙে সবকটি ছাগল কিসে খেয়ে গেছে। আজ সকালে ডাক্তারবাবুর জন্যে ভাল করে একটু মাংস রাঁধবে বলে সে একটা ছাগল কাটতে গিয়ে দেখে, ছাগলের খোঁয়াড়ের দরজা ভাঙা। ভেতরে খালি কটি হাড় আর মাংসের টুকরো ছাড়া অতগুলো জানোয়ারের কিছুমাত্র নেই।

সত্যই ভয়ঙ্কর সংবাদ। ছাগলের খোঁয়াড়ে চিতাবাঘ আগে

পড়েছে বটে, কিন্তু দরজা ভেঙে এর আগে কোন বাঘ ঢুকতে পারে নি। খোঁয়াড়ের দরজা বেশ মজবুত—চিতাবাঘ তো দূরের কথা, কেঁদো বাঘেরও সাধ্য নেই সে দরজা ভেঙে ঢোকে। এর আগে ছুট্‌কো দুটো একটা ছাগল বাঘে নিয়ে গেছে। কিন্তু এমন সর্বনাশ কখনো হয় নি। তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে খোঁয়াড়ে গিয়ে দেখি, তার কথা মিথ্যে নয়।

ডাক্তারবাবু দরজাটা পরীক্ষা করে বললেন যে, বাইরে থেকে যে জানোয়ার ঠেলে দরজা ভেঙেছে, তার গায়ে অসীম ক্ষমতা। কারণ লোহার মজবুত কড়া ভেঙে একেবারে দুমড়ে গেছে।

সত্যি অবাক হয়ে গেছলাম। এত জোর কোন্‌ জানোয়ারের হতে পারে? বাঘ তো নয়ই, কারণ যদি বা অসম্ভব বলশালী কোন বাঘের দ্বারা সম্ভবও হত, তাহলেও একটার বেশি দুটো সে খেয়ে উঠতে পারত না। অনেকগুলো হয়ত মেরে যেত। কিন্তু এ যে সব বিলকুল সাবাড়! আর এ রকম দরজা ভাঙতে পারে বটে হাতি কিন্তু হাতি তো আর ছাগল খায় না!

আমাদের হতভম্ব ভাব দেখে চীনে রাঁধুনি অনেকক্ষণ বাদে সাহস করে বললে, 'আপনারা সেদিন ঠাট্টা করলেন, বাবু! আমি কি আর অমনি অমনি ভয় পেয়েছিলাম! এ সেই শয়তান জানোয়ারের কাজ! চোখে দেখলে হয়ত বিশ্বাস করবেন!'

আজ আর তাকে যেন ঠাট্টা করতে পারলাম না। ডাক্তার-বাবুর দিকে ফিরে বললাম, 'মেঘ না চাইতেই জল এল নাকি! রহস্যময় জানোয়ারের কথা বলতে না বলতেই যে এসে হাজির!'

ডাক্তারবাবু মাটির ওপর ঝুঁকে পড়ে কি পরীক্ষা করছিলেন। কথা কইলেন না।

তার পর থেকে আমাদের বিপদের দিন শুরু হল। কাঠুরেদের ভেতরে কী যে ভয় ঢুকে গেল, সন্ধ্যে হবার দু ঘণ্টা আগে থেকে তারা কাজটাজ ছেড়ে বাসায় গিয়ে ঢোকে। কার সাধ্য তাদের তখন কাজ করায়! আমরা নিজেরাও যে ভয় পাইনি, এমন নয়। তবে,

মুখে সাহস না দেখালে চলে না। সারা রাত পালা করে আমি আর ডাক্তারবাবু বন্দুক ধরে পাহারা দিই। খোঁয়াড়ের দরজা যে জানোয়ার অনায়াসে ভেঙে ফেলতে পারে, আমাদের কেবিনের দেয়াল সে যে ভেঙে ঢুকবে, এ আর কী এমন আশ্চর্যের কথা!

দু-চার মাস কিন্তু নির্বিঘ্নে কেটে গেল। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু তাঁর কাজের জায়গায় ফিরে গিয়ে আবার ঘুরে এসেছেন। সেদিন একজন কাঠুরে এসে খবর দিলে যে, বুনো হাতির দল নদী পার হয়ে বনে এসেছে। তার পরদিন সকালেই বেরোনো হবে ঠিক হল।

সর্বনাশ ঘটল ঠিক সেই রাত্রে।

রাত তখন প্রায় একটা হবে। হঠাৎ কাঠুরেদের তাঁবুগুলো থেকে ভীষণ সোরগোল উঠল। অভ্যাসমত প্রথমেই মনে হল, ছাগলের খোঁয়াড়ে বুঝি বাঘ পড়েছে। তারপরেই মনে পড়ল, ছাগলের খোঁয়াড় তো আর নেই! তা ছাড়া এতো বাঘ তাড়াবার শব্দ নয়, এ যে মানুষের ভীতি—কাতর আর্তনাদ! কাঠুরেদের তাঁবুগুলোর চারিধারে বড় বড় গাছের গুঁড়ির উঁচু বেড়া সে বেড়া ডিঙিয়ে বাঘও ঢুকতে পারে না। বাঘের অত সাহসও সাধারণত হয় না। তবে ব্যাপার কী! আমি ও ডাক্তারবাবু বেশ একটু গোলমালের ভিতর পড়ে গেলাম।

তাড়াতাড়ি আমাদের চাকরবাকরগুলোকে গোটাকতক মশাল জ্বালাবার হুকুম দিয়ে টর্চলাইট ও বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাঠুরেদের আর্তনাদ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু বেশিদূর এগুতে না এগুতেই জন পঁচিশেক কাঠুরে প্রাণভয়ে পাগলের মত হয়ে আমাদের পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ল। ভয়ে তাদের গলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। চোখ কপালে উঠেছে। মুখে জলটল দিতে দু-এক জনের জ্ঞান একটু ফিরে এল। কিন্তু তারা যা বললে, তার স্পষ্ট কোন মানে খুঁজে পাওয়া গেল না। বেশ একটু ভ্যাবাচাকা খেলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। এক হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। হঠাৎ মাঝরাতে নাকি তারা চমকে জেগে উঠে শোনে, বাইরের

কাঠের বেড়া মড়্মড়্ করে কিসের ধাক্কায় ভেঙে যাচ্ছে। তারপর কী যে হল, কে যে কোথায় গেল, কিছুই তারা বলতে পারে না। হঠাৎ যেন তাদের মনে হল, প্রলয় শুরু হয়েছে! তাঁবু, কাঠের ঘর, সব ধুপধাপ করে ভেঙে পড়তে লাগল কিসের চাপে। তারই ভেতর কিসে যেন ধরেছে এমনিভাবে অনেক কাঠুরে নানা জায়গা থেকে চিৎকার করতে লাগল। তারা কজন কিভাবে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে, তারা নিজেরাই জানে না। তাদের একজনের শুধু হাত ভেঙে গেছে। সে বলল, ঠাণ্ডা একটা একশো মণি পাথর যেন তাঁবুর ওপরকার ছাদ ফুঁড়ে তার হাতের ওপর পড়ল! শোলার মত হাতটা তৎক্ষণাৎ মুড়মুড়িয়ে ভেঙে গেল। সে ভাঙা হাতটা নিয়েই কোনরকমে পালিয়ে এসেছে।

তাদের কথা থেকে কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার ডাক্তারবাবু! বুনো হাতির দল চড়াও হয়ে এল নাকি?'

'তাই হবে!' বলে ডাক্তারবাবু সেইদিকে বন্দুক তুলে ছোঁড়বার উদ্যোগ করতেই বললাম, 'ও কী করছেন! কাঠুরেদের গায়েও যে লাগতে পারে!'

'তা পারে!' বলে বন্দুকের মুখ আকাশের দিকে তুলে কয়েকবার আওয়াজ করলেন। তারপর আমায় বললেন, 'আসুন দেখি, ব্যাপারটার অনুসন্ধান এক্ষুণি দরকার।'

মশালের আলোয় পথ দেখে দেখে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন সব প্রায় আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কাঠের বেড়া, তাঁবু ইত্যাদি সব ছারখার হয়ে সে জায়গার যে অবস্থা হয়েছে, তাতে ভেতরে ঢোকে কার সাধ্য! প্রায় পঁচাত্তর জন কাঠুরের ভেতর মাত্র জন পঁচিশ পালিয়ে এসেছে। বাকি সকলের পরিণাম কী হয়েছে ভাবতে ভাবতে ভেতরে গিয়ে যা দেখলাম, সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য জীবনে ভোলবার নয়। মশালের আলোয় দেখা গেল, চারিদিকে রক্ত আর রক্ত! কোথাও একটা কাটা হাত, কোথাও কাটা পা। পঞ্চাশ জন কাঠুরেকে এমনি করে কোন ভয়ঙ্কর মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।

সভয়ে বললাম, 'একি বুনো হাতির পালের কাজ, ডাক্তারবাবু?'

'দেখা যাক!' বলে ডাক্তারবাবু কি যেন ভাবতে বসলেন।

পরের দিন সকাল হতে না হতেই ডাক্তারবাবু বললেন, 'বুনো হাতির পেছনে ধাওয়া করতে হবে। নাহলে এরকম দৌরাত্ম্যের শেষ কোথায় কে জানে?'

যে জন পঁচিশেক কাঠুরে বেঁচে ছিল, তারা কি আর সঙ্গে যেতে চায়? অনেক রকম অনুনয় বিনয় করে, ও শেষে ভয় পর্যন্ত দেখিয়ে তাদের রাজি করানো হল। আমাদের কেবিনের উত্তর দিকের জঙ্গলে বুনো হাতির দল চরছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। সে জঙ্গলটা বিশেষ ঘন নয়। শুধু মাঝে মাঝে পাহাড়ের মত উঁচু উঁচু গাছের সার। দুপুর নাগাদ আমরা হাতির পালের সন্ধান পেলাম। বিরাট জঙ্গলের ভেতর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে হাতির পাল চরে বেড়াচ্ছে। কী ভীষণ তাদের চেহারা, দেখলেই ভয় করে। গর্জন শুনলে শরীরের রক্ত জল হয়ে যায়।

হাতির পালের সন্ধান পেয়েই কিন্তু ডাক্তারবাবু কেমন যেন অদ্ভুত ব্যবহার দেখাতে লাগলেন। বুনো হাতি মারবার নিয়ম হচ্ছে, হাতির পালের পেছুপেছু থেকে একটা ছটকানো হাতি বাছাই করে তার কানে বা বুকে অব্যর্থ লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া। কিন্তু ডাক্তারবাবু আমাদের সকলকে একটা করে খুব উঁচু ও মজবুত গাছ দেখে একেবারে ডগায় চড়ে বসতে বললেন। শুধু তাই নয়, বললেন গাছের ডালের সঙ্গে বেশ করে নিজেদের বেঁধে রাখতে ও তিনি আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত একদম গুলি না ছুঁড়তে। এরকম অদ্ভুত প্রস্তাবের কোন মানে খুঁজে না পেলেও তাঁর কথা আমরা অমান্য করলাম না।

গাছে চড়ে বসে আছি তো বসেই আছি। কিছুই আর হয় না। পায়ের তলায় আমাদের গাছের নিচে হাতির পাল চরছে, নিচের ডালপালা ভেঙে খাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু একবার তাঁর গাছ থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'সব ভাল

করে নিজেদের গাছের সঙ্গে বেঁধেছ তো?' তারপর আবার সব চুপচাপ। বসে বসে শেষে ডাক্তারবাবুর পাগলামিতে বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ডাক্তারবাবু সোল্লাসে উত্তরের দিকে হাত দেখিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'টির‍্যানোসোরাস! টির‍্যানোসোরাস!'

গাছের ওপর থেকে জঙ্গলের বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। ডাক্তার-বাবুর চিৎকারে অবাক হয়ে তাঁর নির্দেশমত উত্তর দিকে দেখবা মাত্র ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল! হাত পা সব তখন শিথিল। বাঁধা না থাকলে সত্যিই গাছ থেকে পড়ে যেতুম। উত্তরের জঙ্গল থেকে যে জানোয়ারটি বেরিয়ে আসছে, চোখে না দেখলে তার আকার ও ভীষণতা কল্পনা করা অসম্ভব। প্রথমে মনে হল, হয়ত স্বপ্ন দেখছি! পাহাড় কি চলতে পারে? কিন্তু স্বপ্ন নয়। পাহাড়ের মতই বিশাল তার চেহারা! সেই পাহাড়ের মত বিরাট দেহ থেকে যে দীর্ঘ গলাটি বেরিয়ে এসেছে, পৃথিবীর কোন জিনিসের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সবচেয়ে বীভৎস বিকট তার দাঁতালো প্রকাণ্ড মুখ। সে মুখ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আগুনের মত লাল একটা বিরাট জিভ লক্ লক্ করে বেরিয়ে আসছে, আবার ফুরুৎ করে ভেতরে চলে যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবুর চিৎকারটা স্মরণ হল—টির‍্যানোসোরাস! এই কি তবে পৃথিবীর আদিম যুগের সেই বিশালকায় সরীসৃপ? বুনো হাতির পাল তখন ভয়ে ক্ষেপে উঠেছে। কোনদিকে যে কে পালাবে, তার ঠিক নেই। এই বিশালকায় টির‍্যানোসোরাসের কাছে হাতিগুলোকেও ইঁদুরের মত দেখাচ্ছিল। যেন ইঁদুরের মতই এক-একটা হাতিকে সে থাবার এক চাপে বা ল্যাজের এক ঝটকায় মেরে ফেলছিল। এ অসম্ভব দৃশ্য কল্পনাও বুঝি করা যায় না। ভীত হাতির পাল প্রাণপণে চেষ্টা করলে কী হবে? হাতির পাল পঞ্চাশ পা দৌড়লে টির‍্যানো-সোরাস এক পা বাড়িয়ে তাদের ধরে ফেলে। দেখতে দেখতে সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ার আমাদের কাছে এসে পড়ল। ভয়ে আমি চোখ না বুজে পারলাম না। শুনলাম ডাক্তারবাবু চিৎকার করে বলছেন,

টির‍্যানোসোরাসের লকলকে জিভটা ডাক্তারবাবুকে স্পর্শ করল

'খবরদার, আমার আগে কেউ গুলি ছুঁড়ো না! সাবধান! সাবধান!' তারপরই ডাক্তারবাবুর গাছ থেকে দড়াম দড়াম করে দু-বার শব্দ।

চোখ খুলে যা দেখলাম, তা মনে করলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। ডাক্তারবাবুর গুলি খেয়ে উত্ত্যক্ত জানোয়ারটা পেছনের দু পায়ে ভর করে ডাক্তারবাবুর গাছ ধরে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মাথা গাছের ডগার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছে। ডাক্তারবাবুকে ধরে আর কি! উন্মাদের মত হয়ে তার ওপর গুলি ছুঁড়লাম। লক্ষ ভ্রষ্ট হবার কথা নয়। অন্যান্য গাছ থেকেও তার গায়ে গুলি এসে পড়তে লাগল। কিন্তু তার যেন ভ্রূক্ষেপও নেই। শুধু ডাক্তারবাবুকে ধরাই তার একমাত্র লক্ষ্য। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, এতবড় বিপদেও অবিচলিত হয়ে ডাক্তারবাবু জানোয়ারটার মাথার দিকে লক্ষ্য করে বন্দুক ধরেছেন। টির‍্যানোসোরাসের লকলকে জিভটা একবার বেরিয়ে ডাক্তারবাবুকে স্পর্শ করল, তারপরেই গুড়ুম দু বার আওয়াজ। আর কিছু প্রয়োজন হল না। কাটা গাছের মত জানোয়ারটার বিশাল গলা যেন হুড়মুড় করে ভেঙে লুটিয়ে পড়ল। সে বিশাল দেহ একটু বুঝি নড়ে উঠল, তারপর কাত হয়ে স্থির হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু গাছ থেকে নেমে এলেন। আমরা তখনও সভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, 'একেবারে দু-চোখের ভেতর দিয়ে গুলি মগজে বিঁধেছে। আর ভয় নেই।'

সেই বিরাট লাশটার পাশে দাঁড়িয়েও যেন ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ডাক্তারবাবু বললেন, 'কাঠুরেদের তাঁবু আক্রমণের দিন থেকেই আমার এরকম সন্দেহ হয়েছিল। তাই তোমাদের কিছু না জানিয়ে গাছে উঠেছিলাম। ওই শক্ত কাঠের বেড়া ভেঙে যে জানোয়ার অনায়াসে খাদ্যের লোভে ঢুকতে পারে, হাতির পালও যে সে আক্রমণ করবে, এ আমি জানতাম। তবে, সে জানোয়ার যে টির‍্যানোসোরাস হবে, তা ভাবিনি। পৃথিবীতে

বিস্ময়ের বস্তু এখনও আছে!'

কিন্তু বিস্ময়ের তখনও বাকি ছিল। টির‍্যানোসোরাসের লাশটার দিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ অস্ফুট চিৎকার করে ডাক্তারবাবু বললেন, 'একি! ডান থাবায় মাত্র দুটি নখ!'

সত্যিই তো! আর সব পায়ে পাঁচটা করে নখ থাকলেও সামনের ডান পাটা যেন কেটে গেছে মনে হল। সে পায়ে দুটি মাত্র নখ?

ডাক্তারবাবু নিজের মনেই বলে যাচ্ছিলেন, 'প্রথম চীনে রাঁধুনির ভয় পাওয়া, তারপর ছাগলের খোঁয়াড় সাবাড়, তারপর কাঠুরেদের তাঁবু আক্রমণ।'

বলতে বলতে ডাক্তারবাবু হঠাৎ পাগলের মত লাফিয়ে উঠলেন, 'হয়েছে, হয়েছে! সমস্ত বিজ্ঞানের জগৎকে এবার আমি স্তম্ভিত করে দেব! এত বড় থিসিস কেউ কখনো ভাবতেও পারেনি! এমন ঘটনা দেখবার ভাগ্য কারুর হয়নি!'

লোকটা পাগল হল নাকি? বললাম, 'কী বকছেন ডাক্তারবাবু?'

'কী আবার বকছি? দেখতে পাচ্ছেন, সামনে ওটা কী?'

'পাচ্ছি বইকি। আপনিই তো বললেন টির‍্যানোসোরাস।'

ডাক্তারবাবু হেসে উঠলেন, 'টির‍্যানোসোরাস না ছাই! টিকটিকি! টিকটিকি! ওটা আমাদের দেওয়ালের সেই সামান্য টিকটিকিটা!'

আমাদের বিমূঢ় ভাব দেখে ডাক্তারবাবু আর একটু স্পষ্ট করে বললেন, 'বুঝতে পারছেন না! সেই টিকটিকিটাই বেড়ে বেড়ে এত বড় হয়েছে! মনে নেই, ছুরিতে তার তিনটে নখ কাটা গেছল—ওই ভাল করে দেখুন দেখি ওর ডান থাবাটা!'

'তা তো দেখছি, কিন্তু—'

'কিন্তু কিচ্ছু নেই এর ভেতর। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কারো এমন ঘটনা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে কি না জানি না। জানোয়ারটির ঘাড়ের কাছে খালের মত একটা কাটা লক্ষ্য করেছেন কি? মনে

আছে, টিকটিকিটার গলাটায় একটু ছুরির আঁচড় লেগেছিল ? সেই দাগই অত বড় হয়েছে। আমার ছুরি অজান্তে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে !

'আর একটু বুঝিয়ে বলুন ডাক্তারবাবু।'

'বুঝিয়ে আর বলব কী, আমিই কি সব বুঝি ? শুধু বুঝেছি, ছুরিটা লেগে কোন রকমে টিকটিকিটার ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড কিভাবে কেটে যায়। তারপর কেমন করে কী হয়েছে জানি না। গ্ল্যাণ্ডটা কাটা যাওয়ার ফলেই তার শরীরে এই অপূর্ব পরিবর্তন শুরু হয়েছে হয়ত। কোন কোন গ্ল্যাণ্ডের শরীরের ওপর এই প্রভাব আছে বলে শুনেছি। যেমন ধরুন, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড। এক্ষেত্রে কোন্ গ্ল্যাণ্ড কীভাবে কাটা গেছে জানি না ; শুধু বলতে পারি যে তারই ফলে ওই জানোয়ারটি বড় হয়ে আমাদের রাঁধুনিটাকে ভয় দেখিয়েছেন, আরো বড় হয়ে ছাগলের বংশ নাশ করেছেন। তারপর আমাদের কাঠুরেদের সর্বনাশ করে এখন হাতির পালের ওপর চড়াও হতে গিয়ে আমাদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আরো কিছুদিন বাঁচলে আরো বড় হতেন কি না জানি না।'

'কিন্তু এ কি সম্ভব! শুধু একটা গ্ল্যাণ্ড কাটা নিয়ে এমন হতে পারে ?'

এই প্রথম ডাক্তারবাবুকে একটু বিরক্ত দেখলাম।

'সম্ভব কি না জানি না, কিন্তু হয়েছে তো দেখছি।' বলে তিনি জানোয়ারটার ঘাড়ের কাটা দাগটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর ডাক্তারবাবু কয়েকদিন বাদেই চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তিনি সে থিসিস বোধ হয় লেখেন নি। লিখলে বিজ্ঞান জগৎ সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে যেত, আর ডাক্তারবাবুর যশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সহকারী হিসেবে আমার নামটাও বোধ হয় ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকত।

পাতালের বিভীষিকা

পৃথিবীর চারটি বড়বড় দেশের উৎসাহ ও টাকায় একেবারে প্রথম শ্রেণীর একটি সাবমেরিন এখন অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে ডুব দিয়ে সাগরের জল প্রায় ক্ষ্যাপার মত ঘুলিয়ে তুলেছে বললে হয়। এটা তার খামখেয়াল নয়। পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকের মতে, বিজ্ঞান ও মানুষের ভাবী ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুতর একটি সমস্যার সমাধান এই সাবমেরিনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ওপর-নির্ভর করছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের অতল জলে কী যে সাবমেরিনের বৈজ্ঞানিক নাবিকরা খুঁজে ফিরছে, কেন যে মানুষের পক্ষে সেটা এমন গুরুতর ব্যাপার, সেই কাহিনীই বলছি।

ব্যাপারটা পৃথিবীর অনেক গুরুতর ঘটনার মতই আরম্ভ হয়েছিল অত্যন্ত নিঃশব্দে। চীন জাপানের যুদ্ধ, স্পেনের বিপ্লব, ইউরোপের গণ্ডগোলে তখন সবাই মত্ত। অস্ট্রেলিয়ার দু একটা কাগজের কোণে যা সামান্য একটা খবর বেরিয়েছিল তার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েনি। যাদের পড়েছিল তারাও সেটাতে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

খবরটা এমন কিছু অসাধারণ নয়। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে উগি নামে ছোট নগণ্য একটি দ্বীপের মালিক মিঃ বাফেট সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি সামুদ্রিক জীবের অস্তিত্বের পরিচয় পেয়ে কাগজে তার বিবরণ পাঠিয়েছিলেন। সেই বিবরণটিকে কেটে ছেঁটে খবরের কাগজের এক কোণে নেহাৎ জায়গা ভরাবার জন্যেই স্থান দেওয়া হয়েছিল। এরকম বিবরণ খবরের কাগজে হামেশাই আসে, অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত আজগুবি গালগল্প বলে ধরা পড়ে। সুতরাং কাগজে এই বিবরণটিকে যে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়নি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই

নেই। সাধারণ লোক তো দূরের কথা, এ বিষয়ে যাদের উৎসাহ থাকার কথা, সেই প্রাণীতত্ত্ববিদদের কেউ এ বিবরণ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল বলে মনে হয় না।

মিঃ বাফেট নিজেও তাঁর আবিষ্কারটির গুরুত্ব অবশ্য কিছুই বোঝেন নি। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা আগাগোড়া দুঃস্বপ্ন কি না, এ বিষয়ে তাঁর নিজেরই একটু সন্দেহ ছিল।

মিঃ বাফেট উগি দ্বীপটি অস্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছে কিনে সেখানে নারকেলের চাষ করেছেন। নারকেলের চাষ ছাড়া আশে-পাশের দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে মুক্তো প্রবাল প্রভৃতি নানা জিনিসের কারবারও তিনি করে থাকেন।

উগি দ্বীপটি নিতান্ত ছোট, লম্বায় চওড়ায় বারো মাইলের বেশি কোথাও নয়। এই দ্বীপটিতে জন পঞ্চাশ সেই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা তাঁরই নারকেল বাগান ও কারবারে চাষী মজুর ও চাকরের কাজ করে।

ঘটনার দিন ছিল উগি দ্বীপের একরকম হাটবার। আশেপাশের দ্বীপগুলি, বিশেষ করে পাশের সান ক্রিস্টোভাল দ্বীপ থেকে, লম্বা লম্বা ক্যানোয় করে বড় বড় সর্দারেরা এসেছে মুক্তো আর প্রবাল, নারকেলের শাঁস আর গজদন্ত ফলের বদলে রঙিন ছিট আর তামাক, সস্তা আয়না চিরুণি আর পুঁতির মালা কিনতে।

সারাদিন কেনা বেচা ও মুখ্যু সর্দারের হিসেব বোঝাবার পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে মিঃ বাফেট বিকেলবেলায় ভাঙা হাটের ভার বিশ্বাসী চাকর টিক্কোর হাতে ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ধারে একটু মাথা ঠাণ্ডা করতে এসেছিলেন।

সন্ধ্যে তখনও হয়নি। প্রবাল দ্বীপের সমুদ্রতট দুধে ধোওয়া শ্বেতপাথরের মেঝের মত ঝকঝক করছে। সমুদ্রের জলের রঙ একটু গাঢ় হয়ে এসেছে নারকেল গাছের সারির পেছনে অস্তমান সূর্যের মরা আলোয়।

মিঃ বাফেট উঁচু একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর গিয়ে বসেছিলেন।

এইটেই তাঁর প্রিয় বিশ্রামের জায়গা। এখান থেকে অনেক দূরে সমুদ্র যেখানে ফেনা ছিটোনো শাদা ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়ছে সেদিকে চেয়ে থাকতে তিনি ভালবাসেন।

অধিকাংশ প্রবাল দ্বীপের মধ্যে এই যে, চারিধার প্রবালের তৈরি ডুবো দেওয়ালে ঘেরা থাকায় তীরের কাছে ঢেউ এর দাপট আর থাকে না। জলের ডুবো প্রবাল প্রাকারে ধাক্কা খেয়ে নিস্তেজ হয়ে ঢেউগুলি সেখানে পৌঁছোয়। সেই অপেক্ষাকৃত শান্ত জলে দুটি বড় বড় কচ্ছপের সাঁতরে বেড়ানো অন্যমনস্কভাবে দেখতে দেখতে হঠাৎ মিঃ বাফেট চমকে উঠলেন।

সমুদ্রের নীল জলের ভেতর থেকে রুপোর মত চকচকে কি একটা প্রাণী তীরের দিকে উঠে আসছে। প্রথমে মিঃ বাফেট সেটাকে একটা সামুদ্রিক মাছই ভেবেছিলেন। কিন্তু সে ভুল ভাঙতে তাঁর দেরি হল না। মাছের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্যই নেই।

তবে প্রাণীটি কী? রঙটা রুপোর মত পড়ন্ত সূর্যের আলোয় চক্-চক্ করে না উঠলে গোড়ায় হয়ত আর একটি কচ্ছপ বলেও সেটাকে ভাবা যেত। মনে করা যেত তার খোলসটাই অমন চক্-চক্ করছে।

কিন্তু শুধু গায়ের রঙে নয়, আকারেও তো তার কচ্ছপের সঙ্গে কোন মিল নেই!

মিঃ বাফেট চোখটা একবার রগড়ে নিলেন। সারাদিন হিসাবের অঙ্ক লিখে লিখে চোখটা খারাপ হল নাকি? না, চোখ তো খারাপ হয়নি। প্রাণীটি সত্যিই অদ্ভুত। দশ বছর ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে তাঁর অনেক দিন কেটেছে। এখানকার গাছপালা মানুষ ও জল স্থলের সব প্রাণীর প্রায় নাড়ি নক্ষত্র তাঁর জানা। কিন্তু এমন প্রাণী তিনি কখনও দেখেন নি।

প্রাণীটি তখন সমুদ্রের জল ছাড়িয়ে তীরের ওপর উঠে এসেছে। মাছ তো নয়ই, কচ্ছপ বা হাঙর কোন কিছুর ধার দিয়েও সে যায় না। তার সঙ্গে মিল অবশ্য একটা কিছুর আছে। কিন্তু সে মিলের কথা ভাবতে যাওয়াটাই মনে হয় যেন মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ।

রূপোর মত ঝকঝকে প্রাণীটি ঠিক যেন একটা বিকৃত চেহারার কবন্ধ বামন। মানুষের মত মাথাটাই তার খালি নেই, কিন্তু ঠিক মানুষের মতই তার দুটি মোটা মোটা পা এবং দেহের দুধারে আজানু নয়, একেবারে আপাদলম্বিত দুটি হাতের মত অঙ্গও তার আছে। দৈর্ঘ্য অবশ্য তার তিন ফুটের বেশি না হলেও পরিধি তার বেশ।

টলমল পায়ে প্রাণীটি তীরের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে—মিঃ বাফেট মন্ত্রমুগ্ধের মত সেদিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর বিশ্বাসী চাকর টিকো যে তাঁর খোঁজে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে খেয়াল তার নেই। হঠাৎ তার ভয়ার্ত চিৎকারে তিনি চমকে উঠলেন।

'দানব! দানব! সমুদ্রের দানব!' মিঃ বাফেট মুখ ফিরে দেখলেন, ভয়ে টিকো একেবারে কাঠ হয়ে গেছে, শুধু চিৎকারের তার কামাই নেই।

সে চিৎকারের ফল যা হবার তাই হল। দেখা গেল প্রাণীটি দ্রুতবেগে সমুদ্রের দিকে আবার ফিরে যাচ্ছে। মিঃ বাফেট তাড়াতাড়ি তার পেছনে যাবার উপক্রম করতেই টিকো একেবারে পাগলের মত তাঁকে জড়িয়ে ধরে সভয়ে বললে, 'দোহাই আপনার, যাবেন না সমুদ্রের দানবের কাছে—তাহলে আর রক্ষা নেই!'

টিকোর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে করতেই প্রাণীটি যখন সমুদ্রের জলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মিঃ বাফেটের আপশোসের আর সীমা রইল না। ধমকে গালাগালি দিয়ে টিকোকে বললে, 'আহাম্মুক কোথাকার! কী করলি বল্ দেখি!'

টিকোর কিন্তু গালাগালে লজ্জিত হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ভয় তখনও তার সম্পূর্ণ কাটে নি। অম্লান বদনে তবু সে জানালো যে অন্যায় সে কিছু করেনি। সমুদ্রের দানবের পরিচয় জানলে সাহেব আর তার কাছে যাবার জন্যে ব্যস্ত হতেন না!

'সমুদ্রের দানব না ছাই! মুখ্যু জানোয়ার কোথাকার! ভাল করে দেখতে পেলুম না তোর আহাম্মুকিতে!'

টিকো এবার একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, তার ভাবনা নেই। একবার যখন দানব এ দ্বীপে উঠেছে, তখন ভাল করে দেখা না দিয়ে সে যাবে না।'

বলতে বলতে তার চোখে মুখে যে আতঙ্ক ফুটে উঠল তাতে মিঃ বাফেট সত্যিই অবাক হতেন, যদি না এদের নানা অর্থহীন কুসংস্কার তাঁর জানা থাকত। তাই তিনি শুধু একটু হেসে তাকে বললেন, 'এ দানব তুই আগে দেখেছিস ?'

টিকো জানালো,—না, তার নিজের দেখা এই প্রথম, কিন্তু দানবের সব কথা সে জানে। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপ নাকি ঝড় জল ভূমিকম্পে মহামারীতে নয়, এই দানবের অত্যাচারেই শ্মশান হয়ে গেছে! অসভ্যদের বল্লম আর সাহেবদের গুলি, কিছুই নাকি এদের ক্ষতি করতে পারে না।

এই মূর্খ কুসংস্কারগ্রস্ত অসভ্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা বৃথা বুঝে মিঃ বাফেট বেশ একটু ক্ষুণ্ণ মনেই তাঁর বাংলোয় ফিরেছেন এবং তারপর তিনি নিজে যা দেখেছেন, তার বর্ণনার সঙ্গে অসভ্য অধিবাসীদের কুসংস্কার জড়িত কাহিনী সমেত একটি বিবরণ অস্ট্রেলিয়ার কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কাটা ছাঁটা হয়ে তা থেকে যেটুকু বিবরণ কাগজে বেরিয়েছে তার পরিণামের কথা আগেই বলা হয়েছে। তারপর সভ্য জগৎ এই ব্যাপারটির গুরুত্ব সম্বন্ধে কতদিনে যে সজাগ হয়ে উঠত কে জানে যদি না—

—যদি না সান ক্রিস্টোভালের রেসিডেন্ট কমিশনার মিঃ সেরিফের কাছে উগি দ্বীপ সম্বন্ধে কয়েকটি ভাসা ভাসা গুজব গিয়ে পৌঁছত, যদি না তিনি স্বয়ং এ ব্যাপারটার খোঁজ নেবার সাধু সঙ্কল্প করতেন, এবং যদি না ঠিক সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত সামুদ্রিক প্রাণীতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক মিঃ মিচেল তাঁর বার্ষিক সাগর শিকারে বেরিয়ে সান ক্রিস্টোভালে মিঃ সেরিফের অতিথি হতেন।

দানব! দানব! সমুদ্রের দানব

মিঃ সেরিফ কিছুদিন থেকেই উগি সম্বন্ধে নানান রকম গুজব শুনতে পাচ্ছিলেন। উগি দ্বীপ সান ক্রিস্টোভালের অধীন, সেখানকার মালিকও তাঁর জাত ভাই। সেই হিসেবে উগি দ্বীপের মালিকের বিপদ আপদে সাহায্য করা কমিশনারের কর্তব্য। তবু খবরগুলো এমন আজগুবি, এবং কমিশনার হিসেবে মিঃ সেরিফের অন্য কাজের চাপ এত বেশি যে এ বিষয়ে কিছু করবার ফুরসত তাঁর এ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু একদিন আর চুপ করে বসে থাকা তাঁর চলল না। সকাল বেলায় খাবার টেবিলেই তাঁকে অত্যন্ত চঞ্চল দেখে ডাঃ মিচেল একটু আশ্চর্য হলেন, 'কী ব্যাপার মিঃ সেরিফ? আপনাকে সকালেই যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে!'

'চিন্তিত নয় ডাঃ মিচেল, বিরক্ত বলতে পারেন।···একে তো সরকারি কাজের এই চাপ, তার ওপর এদেশের লোকের ভূতের ভয় সারিয়ে বেড়াতে হলেই তো গেছি!'

'জুজুর ভয় আবার কোথায় সারাতে হবে?' ডাঃ মিচেল জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই উগি দ্বীপে, আর কোথায়! সেখানকার মালিক মিঃ বার্ফেট শুনছি ভয়ানক নাকি বিপদে পড়েছেন। জুজুর ভয়ে তাঁর চুক্তি করা সমস্ত চাকর বাকর, চাষী নাকি তাঁকে একা ফেলে পালিয়েছে। বেচারার সান ক্রিস্টোভালে এসে খবর দেবার মত একটা ডিঙিও নাকি তারা রেখে যায় নি?'

মিঃ সেরিফ একটু থেমে আবার বললেন, 'জুজুটা কী তা জানেন? সাগর দানব। সাগর থেকে তারা উঠে সব ধ্বংস করে দেয়। শুনেছেন এমন কথা!'

ডাঃ মিচেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শুনেছি।'

মিঃ সেরিফ একটু অধৈর্যের সুরে বললেন, 'শুনেছি আমিও। এ দেশে এ কুসংস্কার বহুকাল থেকে চলে আসছে, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন এসব গাঁজাখুরি গল্প?'

ডাঃ মিচেল তেমনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'এইটুকু শুধু বিশ্বাস করি, যে গাঁজাখুরি গল্পেও একটা কিছু সত্যের ভিত আছে।'

মিঃ সেরিফ তাঁর দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, 'তাহলে চলুন না মশাই আমার সঙ্গে! সত্যের ভিতটা একটু খুঁড়ে আসবেন! অনেক রকম নতুন প্রাণী তো আপনার সংগ্রহ হয়েছে, একটা সাগর দানবই বাদ যায় কেন? কেমন, যাবেন?'

মিঃ সেরিফের ঠাট্টাটুকু উপেক্ষা করে ডাঃ মিচেল বললেন, 'আমি প্রস্তুত।'

সেইদিনই বিকেলে সান ক্রিস্টোভাল থেকে সংকারি বড় মোটর-বোট 'মিণ্ডিনি' উগি দ্বীপে গিয়ে নোঙর করল। মাঝি মাল্লাদের বোটেই রেখে জনকয়েক দেশী কনস্টেবল নিয়ে মিঃ সেরিফ ও ডাঃ মিচেল মিঃ বাফেটের বাংলোয় গিয়ে উঠলেন।

বাংলায় পৌঁছে তাঁরা সত্যি অবাক হলেন। দেশী চাষী মজুর, চাকর বাকর না হয় সব পালিয়েছে, কিন্তু স্বয়ং মিঃ বাফেট গেলেন কোথায় এই সন্ধ্যেবেলায়! বাংলো এবং আশেপাশের সমস্ত জায়গা সন্ধান করেও তাঁর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। সরে পড়বার আগে দেশী লোকেরা কি তাঁকে শেষ করে দিয়ে গেছে তাহলে? কিন্তু আশ্চর্য! গুদোম ঘরে বা বাংলোর কোন জিনিসপত্রই চুরি যায় নি। মনিবকে মেরে ফেলে চাকরেরা সেসব লুট করবার লোভ নিশ্চয়ই সংবরণ করতে পারত না!

যাই হোক রাত্রিটা তাঁদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে। সকালের আগে আর মিঃ বাফেটের অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করার চেষ্টা বৃথা বুঝে রাতটা তাঁরা বাংলোতেই নিশ্চিন্ত বিশ্রামে কাটাবার সঙ্কল্প করলেন।

কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে রাত্রিটা বিশ্রাম করে কাটানো তাঁদের হল না। সন্ধ্যা তখন সবে উত্তীর্ণ হয়েছে। কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে টেবিলের দু ধারে বসে মিঃ সেরিফ ও ডাঃ মিচেল সাগর দানবের

কিংবদন্তী সম্বন্ধে গল্প করেছিলেন।

মিঃ সেরিফ বলেছিলেন, 'সাগর দানব বলতে একটা কিছু আছে বলে আপনি কেন মনে করেন, ডাঃ মিচেল ?'

'মনে করি এইজন্যে যে, প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে সাগর-দানবের কিংবদন্তী বহুদিন থেকে চলে আসছে। তার সবটাই কুসংস্কার আর বাজে কল্পনা বলে আমার মনে হয় না।'

'কিন্তু তাহলে এতদিন সভ্য মানুষ তার খোঁজ পেত না ? আপনাদের বিজ্ঞানও কিছু জানত না ?'

ডাঃ মিচেল একটু হেসে বললেন, 'সভ্য মানুষ আর বিজ্ঞানকে সবজান্তা মনে করেছেন কেন ? বিজ্ঞান তো সেদিনের। পৃথিবীর রহস্যের এখনও অনেক কিছু জানবার সে সুযোগ পায়নি।'

'কিন্তু সাগর দানব তাহলে কী হতে পারে ?'

'ঠিক করে কিছু বলা যায় না। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার কোনরকম কল্পনাও সাজে না। তবে আমার অনুমান, সাগর দানব গভীর সমুদ্রের কোন অজানা প্রাণী।'

ডাঃ মিচেলের কথা আর শেষ হল না। হঠাৎ বাইরে একটা অত্যন্ত গোলমাল শোনা গেল। দু জনে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়তেই একজন পুলিশ এসে জানালো একটি লোক লুকিয়ে বন্দুক বারুদ প্রভৃতি রাখবার ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছিল, তাকে ধরতে গিয়েই এই গোলমাল।

এই জনশূন্য দ্বীপে কেউ নেই বলেই তো তাঁরা জানতেন। এখানে বারুদ ঘর লুট করার শখ আবার কার হল ? ডাঃ মিচেল ও মিঃ সেরিফ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুলেন। কিন্তু চোরকে দেখেই তাঁদের চক্ষুস্থির !

'একি, এ যে মিঃ বাফেট !'

জ্যোৎস্নারাত্রি হলেও বড় বড় নারেকেল গাছের ছায়ায় বারুদ-ঘরের দিকটা বেশ অন্ধকার। তারই দরুণ পুলিশ মিঃ বাফেটকে চিনতে পারে নি। তারা এবার তাড়াতাড়ি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে

সঙ্কোচে দূরে গিয়ে দাঁড়ালো।

মিঃ বাফেটের কিন্তু তখনও রাগ যায় নি। তাঁকে ভয়ানক উত্তেজিতও মনে হচ্ছিল। চড়া গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, আমি মিঃ বাফেট। আপনারা কে শুনতে পাই! পরের এলাকায় মাতব্বরি করতে এসেছেন?'

উত্তর না দিয়ে মিঃ সেরিফ একটু আলোয় গিয়ে দাঁড়াতেই মিঃ বাফেটের স্বর বদলে গেল, 'আপনি মিঃ সেরিফ! আমি ভাবতেই পারিনি! যাক ভালোই হয়েছে, ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন।'

রাগ পড়ে গেলেও মিঃ বাফেটের উত্তেজনা একটুও কমেনি দেখা গেল।

মিঃ সেরিফ সেটুকু লক্ষ্য করে বললেন, 'তা তো এসেছি। কিন্তু আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথায়! এত রাত্রে বারুদ ঘরেই বা ঢুকছিলেন কেন?'

'বারুদ ঘরে ঢুকছিলাম গেলিগ্নাইট নেবার জন্যে। তারা এসে পড়েছে যে মিঃ সেরিফ! এসে পড়েছে!' মিঃ বাফেটের ভাবভঙ্গি অনেকটা অপ্রকৃতিস্থের মত।

'কারা এসে পড়েছে?' ডাঃ মিচেলই জিজ্ঞেস করলেন এবার।

'কারা আবার, সাগর দানব! সারাদিন আমি সেই পাহারাতেই ছিলাম। কিন্তু একটি দুটি নয়, দলে দলে তারা এসেছে! সেই জন্যেই বন্দুকের বদলে গেলিগ্নাইট নিতে এসেছি। আর সময় নেই মিঃ সেরিফ! গেলিগ্নাইট নিয়ে এখুনি আমাদের যাওয়া দরকার!'

এবার মিঃ সেরিফের স্থির বিশ্বাস হল, লোকজন পালাবার পর কদিন একা একা নির্জন দ্বীপে কাটিয়ে ভয়ে ভাবনায় মিঃ বাফেটের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি মিঃ বাফেটকে একরকম জোর করে বাংলোর দিকে ছেলে ভোলানোর মত স্বরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে বললেন, 'আসুক তারা! আমরা এখান থেকেই তাদের সঙ্গে লড়ব।'

কিন্তু মিঃ বাফেট সজোরে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অধীরভাবে

বললেন, 'আপনারা কি আমায় পাগল ভাবছেন? শুনুন, এর আগেও তারা দু বার এখানে হানা দিয়েছে। আমাদের বন্দুকের জোরে অনেক কষ্টে তাদের তাড়িয়েছি। কিন্তু একটিকেও মারতে পারিনি। বন্দুকের গুলি যেন তাদের গায়ে লাগে না! আমার লোকজন কি অমনি পালিয়েছে মনে করেন? আপনারা কি বিশ্বাস করছেন না আমার কথা?'

মিঃ সেরিফ কী বলতেন কে জানে, কিন্তু ডাঃ মিচেল এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'নিশ্চয় বিশ্বাস করছি। চলুন কোথায় যাবেন।'

এ অঞ্চলের প্রায় সব দ্বীপেই বারুদ ঘরে মাছ ধরা, পাহাড় ভাঙা প্রভৃতি কাজের জন্য বেশ কিছু গেলিগ্নাইট রাখা হয়। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খালি টিনে সেই গেলিগ্নাইট ভরে পট্‌কা ও পলতে লাগিয়ে গোটাকয়েক চলনসই বোমা তৈরি করা হল। তারপর মিঃ বাফেটের পিছু পিছু নারকেল বাগানের ভেতর দিয়ে সবাই তীরের দিকে চললেন।

কিন্তু বেশি দূর তাঁদের যেতে হল না। নারকেল বাগানের আবছা অন্ধকার যেখানে জ্যোৎস্নার আলোয় ধবধবে বালুতটে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পৌঁছবার আগেই মিঃ বাফেট হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। আলো ছায়ার সতরঞ্চ কাটা ঘন নারিকেল বাগানের পথে চকচকে কোন জিনিসে প্রতিফলিত আলোর ঝিলিক তখন আরো অনেকে দেখতে পেয়েছে।

সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনের দৃশ্য সত্যই বিশ্বাসের অতীত! টলটলে পায়ে একসার দিয়ে প্রায় কুড়িটি যে অপরূপ মূর্তি একবার ছায়ায় ঢাকা পড়ে একবার চাঁদের আলোয় ঝলমল করে এগিয়ে আসছে, তারা সত্যই বাস্তব জগতের কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। তারা যেন প্রাচীন কালের ভূতপ্রেত দানা দৈত্যের কোন কাল্পনিক কাহিনীর বই থেকে বেরিয়ে এসেছে!

মিঃ সেরিফ ডাঃ মিচেলের কানে চুপি চুপি বললেন, 'এরা যে দু পায়ে মানুষের মত হাঁটে, ডাঃ মিচেল! সমুদ্রে আবার এরকম

প্রাণী কী আছে! আর সমুদ্রের প্রাণী ডাঙায় বা বাঁচে কী করে?'

ডাঃ মিচেল নিজের হাতের বোমাটা বাগিয়ে ধরে বললেন, 'সব রহস্যের এখনই মীমাংসা হবে!'

কিন্তু মীমাংসা অত সহজে হল না। অপরূপ মূর্তিগুলি নাগালের মধ্যে এসে পড়তেই সকলে বোমার পলতেতে আগুন দিয়ে সেগুলি তাদের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। প্রচণ্ড শব্দে সেগুলি ফেটে যাবার পর দেখা গেল, উদ্দেশ্য তাদের সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি।

ভীত প্রাণীগুলি তখন সবেগে সমুদ্রের দিকে পালাচ্ছে। মোটা মোটা টলটলে পায়ে তারা যে অত জোরে ছুটতে পারে তা গোড়ায় ভাবা যায় নি।

তাদের অনুসরণ করবার চেষ্টা না করে বোমা যেখানে পড়ে ফেটে ছিল সেখানেই সকলে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা আধটা মৃতদেহ নিশ্চয় সেখানে পড়ে আছে। ডাঃ মিচেলের আগ্রহ সেই বিষয়েই।

একেবারে আস্ত না হলেও গোটাকতক অসম্পূর্ণ লাশও পাওয়া গেল, কিন্তু উৎসাহ ভরে সেগুলি আলোয় টেনে পরীক্ষা করতে গিয়ে ডাঃ মিচেল একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন!

এ আবার কী রকম প্রাণী! প্রাণীর দেহ কি শক্ত ধাতুর পাত আর তার দিয়ে তৈরি হয়!

মিঃ সেরিফকে তার পরদিনই সান ক্রিস্টোভালে যেতে হয়েছে। সাগর দানবের রহস্য যত গভীরই হোক, রেসিডেণ্ট কমিশনারের পক্ষে তার মীমাংসার জন্যে বসে থাকা চলে না। ডাঃ মিচেল কিন্তু সেই থেকে মিঃ বাফেটের সঙ্গে উগি দ্বীপেই আছেন। আহার নিদ্রা তিনি একরকম ভুলে গেছেন বললেই হয়, সাগর দানবের অদ্ভুত রহস্য এখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু ভেবে তিনি কোন দিকেই কূল কিনারা পাননি। পরের দিন সকালেই যতগুলি সম্ভব বোমার আঘাতে ফাটা সাগর দানবের টুকরো তিনি সংগ্রহ করে আনিয়েছেন। তন্ন তন্ন করে সেগুলি বারবার পরীক্ষা করে দেখেছেন,

কিন্তু তাতে, সেগুলি যে কোনপ্রকার ধাতু ছাড়া আর কিছু নয়, তাই আরো বেশী প্রমাণ হয়েছে। প্রোটোপ্লাজম ছাড়া কোন প্রাণীদেহ হয় না, কিন্তু প্রোটোপ্লাজম্ দূরে থাক, মাছের পটকার মত একটি করে বড় রবার গোছের জিনিসের থলে ছাড়া এ প্রাণীর দেহে কোন নরম জিনিসই নেই। সবই কঠিন—একরকম মিশ্রিত ধাতুর পাত আর তার।

ডাঃ মিচেলের মাথা ক্রমশই বেশি গুলিয়ে গেছে। এগুলি যন্ত্রই যদি হয় তাহলে এ যন্ত্র সৃষ্টি করেছে কারা? পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক জাত কোথায় আছে। এ যন্ত্র প্রশান্ত মহাসাগরের এই এই নগণ্য দ্বীপে পাঠাবার তাদের উদ্দেশ্য কী? আর যন্ত্র হলেও এগুলি কোথা থেকে কে চালাচ্ছে?

এসব প্রশ্নের মীমাংসা শেষ পর্যন্ত সামান্য একটা দেশী পুলিশের ছেলেমানুষির ফলে সম্ভব হবে কে জানত!

ডাঃ মিচেল কদিন ধরে এ রহস্য ভেদ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হতাশ মনে তখন সান ক্রিস্টোভাল হয়ে আবার অস্ট্রেলিয়া ফিরে যাবার সঙ্কল্প করেছেন। এত বড় আবিষ্কারের কথা কিছুই তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে জানাতে পারবেন না, এই তাঁর দুঃখ। আসল রহস্য সমাধান না করতে পারলে সাগর থেকে যন্ত্র দানব ওঠার কথা তাঁর মুখ থেকে বেরুলেও যে পাগলামি বলে গণ্য হবে, একথা তিনি জানেন। তাই তিনি এ বিষয়ে নীরব থাকাই উচিত বলে ঠিক করেছেন।

রওনা হবার আগের রাত্রে একজন দেশী পুলিশকে তাঁর জিনিসপত্র গোছাতে বলে তিনি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলেন মিঃ বাফেটের সঙ্গে। ফিরে এসে পুলিশের কাজ দেখে তিনি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সে হতভাগ্য তাঁকে তখন লক্ষ্য করে নি। মাছের পটকার মত রবারের থলেটা সে ঘুঁসি মেরে ফাটাবার মজাতেই মত্ত।

তার গালে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করবার জন্য ডাঃ মিচেল

পেছন থেকে হাত তুললেন, কিন্তু চড় মারা আর হল না। হঠাৎ ফট্ করে পটকার মত থলেটা ফেটে গেল এবং তার থেকে কিলবিল করে যে জিনিসটা বেরিয়ে এল তার দিকে চেয়ে ডাঃ মিচেলের চোখে আর পলক পড়ল না বলা চলে!

জিনিস নয়, সেটি প্রাণী—অদ্ভুত জাতের একটি অক্টোপাস। তাঁর চোখের সামনেই তার চেহারা ফুঁ দেওয়া বেলুনের মত ফুলে উঠে ফুটি ফাটা হয়ে গেল। ডাঃ মিচেল বিস্ময়ে উত্তেজনায় খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে থেকে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি!'

মিঃ বাফেট ছুটে এলেন, 'কী পেয়েছেন, মিঃ মিচেল?'

'কী আবার! সাগর দানবের রহস্যের কিনারা! আসল সাগর দানব কে জানেন? ওই দেখুন। মানুষ যেমন সমুদ্রে সাবমেরিন চালায় এও তেমনি স্থলের ওপর ওঠার যন্ত্র উদ্ভাবন ও আয়ত্ত করেছে।'

ডাঃ মিচেল তারপর একটু বিশদ করে রহস্যটা বুঝিয়ে দিলেন।

যে যন্ত্রটি তাঁরা দেখেছেন, সেটি সাগর দানবের বাহন মাত্র। সাগর দানব আসলে ঐ ছোট অক্টোপাস।

সমুদ্রের বুকে অত্যন্ত গভীর স্তরে যে তার বাস, রবারের থলে ফেটে যাবার পর তার দেহ ফেঁপে ফুলে ওঠাই তার প্রমাণ। সমুদ্রের নিচে জলের চাপ অনেক বেশি, সেই চাপ ও স্বাভাবিক জলের আবেষ্টন রবারের থলেটির ভেতর বজায় রাখবার ব্যবস্থা আছে। রবারের থলেটির ভেতর থেকেই সাগর দানব তার যন্ত্র চালায়। ফেটে যেতে বাইরের চাপ হালকা হয়ে যেতেই সাগর দানবের দেহের রবারের থলেটি ফেঁপে ফুলে এই অবস্থা হয়েছে।

মিঃ বাফেট সবিস্ময়ে বললেন, 'কিন্তু সামান্য অক্টোপাসের—'

ডাঃ মিচেল তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'সামান্য নয় মিঃ বাফেট। অক্টোপাস যে সমুদ্রের সব জীবশ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, এ প্রমাণ আমরা আগেও পেয়েছি। তবুও, এতদূর যে তারা যেতে পারে তা ভাবতে পারিনি।'

তারপর ডাঃ মিচেল সাগর দানবের রহস্য সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর

প্রবন্ধ নানা বৈজ্ঞানিক কাগজে লেখেন, সাধারণের কাছে তা দুর্বোধ্য হলেও পৃথিবীর সর্বত্র বড় বড় দেশের টনক তাতে নড়ে উঠেছে। সাগরের অতলে আক্টোপাস জাতীয় যে প্রাণী ক্ষমতায় এতদূর অগ্রসর হয়ে মানুষের সঙ্গে টেক্কা দেবার উপক্রম করেছে, তাকে অবজ্ঞা করা আর উচিত মনে হয়নি। সকলেই বুঝেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের কোন গোপন কোণে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী জলজ প্রাণীর এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। তার সন্ধান সময় থাকতে আর না নিলে নয়।

অত্যন্ত শক্তিমান একটা সাবমেরিন তাই প্রশান্ত মহাসমুদ্রের জল ঘুলিয়ে ফিরছে। সন্ধান কিন্তু এখনও মেলে নি।

ব্যোমযাত্রীর ডায়রি

প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর ডায়রিটা আমি পাই তারক চাটুজ্যের কাছ থেকে।

একদিন দুপুরের দিকে আপিসে বসে পূজো সংখ্যার জন্য একটা লেখার প্রুফ দেখছি, এমন সময় তারকবাবু এসে একটা লাল খাতা আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখো। গোল্ড মাইন।'

তারকবাবু এর আগেও কয়েকবার গল্পটল্প এনেছিলেন। খুব যে ভালো তা নয়; তবে বাবাকে চিনতেন, আর ছেঁড়া জামাটামা দেখে মনে হত ভদ্রলোক বেশ গরিব। তাই প্রতিবারই লেখাগুলোর জন্য পাঁচ দশ টাকা করে দিয়েছি।

এবারে গল্পের বদলে ডায়রিটা দেখে একটু আশ্চর্য হলাম।

প্রোফেসর শঙ্কু বছর পনেরো নিরুদ্দেশ। কেউ কেউ বলেন তিনি নাকি কী একটা ভীষণ এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এও শুনেছি যে তিনি নাকি জীবিত; ভারতবর্ষের কোন অখ্যাত অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলে আত্মপ্রকাশ করবেন। এ সবের সত্যিমিথ্যে জানি না, তবে এটা জানতাম যে তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর যে ডায়রি থাকতে পারে সেটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সে ডায়রি তারকবাবুর কাছে এল কী করে?

জিজ্ঞেস করাতে তারকবাবু একটু হেসে হাত বাড়িয়ে আমার মসলার কৌটোটা থেকে লবঙ্গ আর ছোট এলাচ বেছে নিয়ে বললেন, 'সুন্দরবনের সে ব্যাপারটা মনে আছে তো?'

এই রে, আবার বাঘের গল্প। তারকবাবু তাঁর সব ঘটনার মধ্যেই বাঘ জিনিসটাকে যেভাবে টেনে আনেন সেটা আমার মোটেই ভালো লাগে না। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কোন্

ব্যাপারের কথা বলছেন ?'

'উল্কাপাত ! ব্যাপার তো একটাই।'

ঠিক ঠিক। মনে পড়েছে। এটা সত্যি ঘটনা বটে। কাগজে বেরিয়েছিল। বছরখানেক আগে একটা উল্কাখণ্ড সুন্দরবনের মাথারিয়া অঞ্চলে এসে পড়েছিল। বেশ বড় পাথর। কলকাতার যাদুঘরে যেটা আছে তার প্রায় দ্বিগুণ। মনে আছে, কাগজে ছবি দেখে হঠাৎ একটা কালো মড়ার খুলি বলে মনে হয়েছিল।

তারকবাবু বললেন, 'বলছি। ব্যস্ত হয়ো না। আমি গেস্‌লাম ওই মওকায় যদি কিছু বাঘছাল জোটে। ভালো দর পাওয়া যায়, জান তো ? আর ভাবলুম অত জন্তুজানোয়ার মোলো, তার মধ্যে কি গুটি চারেক বাঘও পড়ে থাকবে না ? কিন্তু সে গুড়ে বালি। লেট হয়ে গেল। গিয়ে দেখি সব উধাও। যে যা পেয়েছে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে। হরিণ টরিণ কিচ্ছু নেই।'

'তাহলে ?...'

'ছিল কিছু গোসাপের ছাল। তাই নিয়ে এলুম। আর এই খাতাটা।'

একটু অবাক হয়ে বললাম, 'খাতাটা কি ওইখানে...?'

'গর্তের ঠিক মধ্যিখানে। পাথরটা পড়ায় একটা গর্ত হয়েছিল জান তো ? তোমাদের চারখানা হেদো তার মধ্যে ঢুকে যায়। এটা ছিল তার ঠিক মধ্যিখানে।'

'বলেন কী !'

'বোধহয় পাথরটা যেখানে পড়েছিল তার খুব কাছেই। লাল-লাল কী একটা মাটির ভেতর থেকে উঁকি মারছে দেখে টেনে তুললাম। তারপর খুলতেই শঙ্কুর নাম দেখে পকেটস্থ করলাম।'

'উল্কার গর্তের মধ্যে খাতা ? তার মানে কি...?'

'পড়ে দেখো। সব জানতে পারবে। তোমরা তো বানিয়ে বানিয়ে গল্পটল্প লেখো, আমিও লিখি। এ তার চেয়ে ঢের মজাদার। এ আমি হাতছাড়া করতাম না, বুঝলে! নেহাত বড় টানাটানি

যাচ্ছে তাই…’

টাকা বেশি ছিল না কাছে। তাছাড়া ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাই কুড়িটা টাকা দিলাম ভদ্রলোককে। দেখলাম তাতেই খুশি হয়ে আমায় আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

তারপর পূজোর গোলমালে খাতাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই সেদিন আলমারি খুলে চলন্তিকাটা টেনে বার করতে গিয়ে ওটা বেরিয়ে পড়ল।

খাতাটা হাতে নিয়ে খুলেই কেমন যেন খটকা লাগল।

যতদূর মনে পড়ে প্রথমবার দেখেছিলাম কালির রং ছিল সবুজ। আর আজ দেখছি লাল। এ কেমন হল ?

খাতাটা পকেটে নিয়ে নিলাম। মানুষের তো ভুলও হয়। নিশ্চয়ই অন্য কোন লেখার সবুজ কালির সঙ্গে গোলমাল করে ফেলেছি।

বাড়িতে এসে আবার খাতটা খুলতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।

এবার দেখি কালির রং নীল।

তারপর এক আশ্চর্য অদ্ভুত ব্যাপার। দেখতে দেখতে চোখের সামনে নীলটা হয়ে গেল হলদে।

এবারে তো আর কোন ভুল নেই ; কালির রং সত্যিই বদলাচ্ছে।

হাতের কাঁপুনিতে খাতাটা মাটিতে পড়ে গেল! আমার ভুলো কুকুরটা যা পায় তাতেই দাঁত বসায়। খাতাও বাদ গেল না। কিন্তু আশ্চর্য! যে দাঁত এই দুদিন আগেই আমার নতুন তালতলার চটিটা ছিঁড়েছে, এই খাতার কাগজ তার কামড়ে কিচ্ছু হল না।

হাত দিয়ে টেনে দেখলাম এ কাগজটা ছেঁড়া মানুষের সাধ্যি নয়। টানলে রবারের মতো বেড়ে যাচ্ছে, আর ছাড়লে যে-কে-সেই।

কী খেয়াল হল, একটা দেশলাই জ্বেলে কাগজটায় ধরলাম। পুড়ল না। খাতাটা পাঁচ ঘণ্টা উনুনের মধ্যে ফেলে রেখে দিলাম। কালির রং যেমন বদলাচ্ছিল বদলাল, কিন্তু আর কিচ্ছু হল না।

সেই দিনই রাত্রে ঘুমটুম ভুলে গিয়ে তিনটে অবধি জেগে খাতাটা পড়া শেষ করলাম। যা পড়লাম তা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

এসব সত্যি কি মিথ্যে, সম্ভব কি অসম্ভব, তা তোমরা বুঝে নিও।

১লা জানুয়ারী।

আজ দিনের শুরুতেই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল।

রোজকার মতো আজও নদীর ধারে মর্নিংওয়াক সেরে ফিরছি। শোবার ঘরে ঢুকতেই একটা বিদঘুটে চেহারার লোকের সামনে পড়তে হল। চমকে গিয়ে চিৎকার করেই বুঝতে পারলাম যে ওটা আসলে আয়না, এবং লোকটা আর কেউ নয়—আমারই ছায়া। এক বছরে আমারই চেহারা ওইরকম হয়েছে। আমার আয়নার প্রয়োজন হয় না বলে ওটার উপর ক্যালেণ্ডারটা টাঙিয়ে রেখেছিলাম; আজ সকালেই বোধহয় প্রহ্লাদটা বছর শেষ হয়ে গেছে বলে সর্দারি করে ওটাকে নামিয়ে রেখেছে। ওকে নিয়ে আর পারা গেল না। সাতাশ বছর ধরে আমার সঙ্গে থেকে আমার কাজ করেও ওর বুদ্ধি হল না। আশ্চর্য!

চিৎকার শুনে প্রহ্লাদ ঘরে এসে পড়েছিল। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার মনে করে আমার Snuff-gun বা নস্যাস্ত্রটা ওর উপর পরীক্ষা করা গেল। দেখলাম, এ নস্যির যা তেজ, তাগ করে গোঁফের কাছাকাছি মারতে পারলেই যথেষ্ট কাজ হয়। এখন রাত এগারোটা। ওর হাঁচি এখনো থামে নি। আমার হিসেব যদি ঠিক হয় তো তেত্রিশ ঘণ্টার আগে ও হাঁচি থামবে না।

২রা জানুয়ারী।

রকেটটা নিয়ে যে চিন্তাটা ছিল, ক্রমশই সেটা দূর হচ্ছে। যাবার দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই মনে জোর পাচ্ছি, উৎসাহ পাচ্ছি।

এখন মনে হচ্ছে যে প্রথমবারের কেলেঙ্কারিটার জন্য একমাত্র প্রহ্লাদই দায়ী। ঘড়িটায় দম দিতে গিয়ে সে যে ভুল করে কাঁটাটাই ঘুরিয়ে ফেলেছে তা আর জানব কী করে? এক সেকেণ্ড এদিক ওদিক হলেই এসব কাজ পণ্ড হয়ে যায়। আর কাঁটা ঘোরানোর

ফলে আমার হয়ে গেল প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লেট। রকেট যে খানিকটা উঠেই গোঁৎ খেয়ে পড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

রকেট পড়ায় অবিনাশবাবুর মুলোর ক্ষেত নষ্ট হওয়ার দরুন ভদ্রলোক পাঁচশ টাকা ক্ষতিপূরণ চাইছেন। একেই বলে দিনে ডাকাতি। এদিকে এত বড় একটা প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হতে চলেছিল তার জন্য কোন আক্ষেপ বা সহানুভূতি নেই।

এই সব লোককে জব্দ করার জন্য একটা নতুন কোন অস্ত্রের কথা ভাবা দরকার।

৫ই জানুয়ারী।

প্রহ্লাদটা বোকা হলেও ওকে সঙ্গে নিলে হয়তো সুবিধা হবে। আমি মোটেই বিশ্বাস করি না যে এই ধরনের অভিযানে কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরই প্রয়োজন। অনেক সময় যাদের বুদ্ধি কম হয় তাদের সাহস বেশি হয়, কারণ ভয় পাবার কারণটা ভেবে বের করতেও তাদের সময় লাগে।

প্রহ্লাদ যে সাহসী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেবার যখন কড়িকাঠ থেকে একটা টিকটিকি আমার বাইকনিক অ্যাসিডের শিশিটার উপর পড়ে সেটাকে উল্টে ফেলে দিল, তখন আমি সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু করতে পারছিলাম না। স্পষ্ট দেখছি অ্যাসিডটা গড়িয়ে গড়িয়ে প্যারাডক্সাইট পাউডারের স্তূপটার দিকে চলেছে, কিন্তু দুটোর কনট্যাক্ট হলে যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হবে তাই ভেবেই আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে।

এমন সময় প্রহ্লাদ ঘরে ঢুকে কাণ্ডকারখানা দেখে একগাল হেসে হাতের গামছাটা দিয়ে অ্যাসিডটা মুছে ফেলল। আর পাঁচ সেকেণ্ড দেরি হলেই আমি, আমার ল্যাবরেটরি, বিধুশেখর, প্রহ্লাদ, টিকটিকি, এসব কিছুই থাকত না।

তাই ভাবছি হয়তো ওকে নেওয়াই ভালো। ওজনেও কুলিয়ে যাবে। প্রহ্লাদ হল দু মন সাত সের, আমি এক মন এগারো সের,

বিধুশেখর সাড়ে পাঁচ মন, আর জিনিসপত্তর সাজসরঞ্জাম মিলিয়ে মন পাঁচেক। আমার রকেটে কুড়ি মন পর্যন্ত জিনিস নির্ভয়ে নেওয়া চলতে পারে।

৬ই জানুয়ারী।

আমার রকেটের পোশাকটার আস্তিনে কতগুলো উচ্চিংড়ে ঢুকেছিল, আজ সকালে সেগুলো ঝেড়েঝুড়ে বার করছি, এমন সময় অবিনাশ-বাবু এসে হাজির। বললেন, 'কী মশাই, আপনি তো চাঁদপুর না মঙ্গলপুর কোথায় চললেন। আমার টাকাটার কী হল?'

এই হল অবিনাশবাবুর রসিকতার নমুনা। বিজ্ঞানের কথা উঠলেই ঠাট্টা আর ভাঁড়ামো। রকেটটা যখন প্রথম তৈরি করছি তখন একদিন এসে বললেন, 'আপনার ওই হাউইটা এই কালীপূজোর দিনে ছাড়ুন না। ছেলেরা বেশ আমোদ পাবে।'

এক এক সময় মনে হয় যে পৃথিবীটা যে গোল, এবং সেটা যে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সেটাও বোধহয় অবিনাশবাবু বিশ্বাস করেন না।

যাই হোক; আজ আমি তাঁর ঠাট্টায় কান না দিয়ে বরং উল্টে তাঁকে খুব খাতির টাতির করে বসতে বললাম। তারপর প্রহ্লাদকে বললাম চা আনতে। আমি জানতাম যে অবিনাশবাবু চায়ে চিনির বদলে স্যাকারিন খান। আমি স্যাকারিনের বদলে ঠিক সেইরকমই দেখতে একটি বড়ি তাঁর চায়ে ফেলে দিলাম। এই বড়িই হল আমার নতুন অস্ত্র। মহাভারতের জৃম্ভণাস্ত্র থেকেই আইডিয়াটা এসেছিল, কিন্তু এটায় যে শুধু হাঁই উঠবে তা নয়। হাঁই এর পর গভীর ঘুম হবে, এবং সেই ঘুমের মধ্যে সব অসম্ভব ভয়ঙ্কর রকমের স্বপ্ন দেখতে হবে।

আমি নিজে কাল চার ভাগের এক ভাগ বড়ি ডালিমের রসে ডাইলিউট করে খেয়ে দেখেছি। সকালে উঠে দেখি স্বপ্ন দেখে ভয়ের চোটে আমার দাড়ির বাঁ দিকটা একেবারে পেকে গেছে।
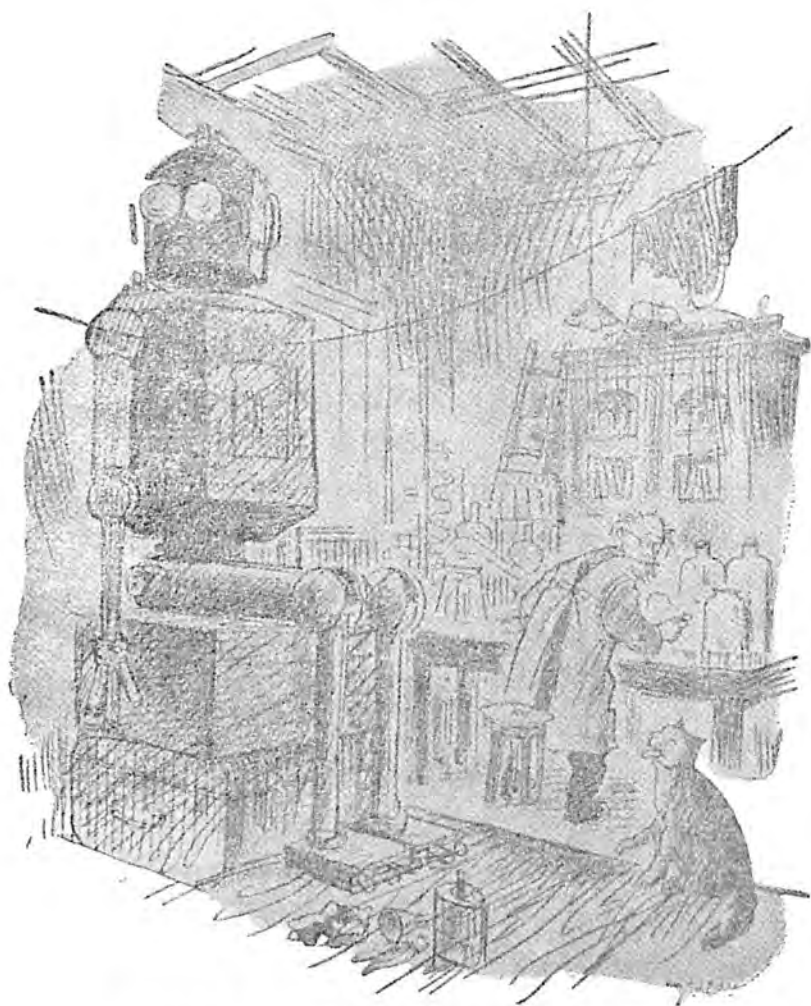
বিধুশেখরের লোহার মাথাটা ভীষণভাবে এপাশ ওপাশ হচ্ছে

৮ই জানুয়ারী।

নিউটনকেও সঙ্গে নেব। কদিন ধরেই আমার ল্যাবরেটরির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে এবং করুণস্বরে ম্যাও ম্যাও করছে। বোধহয় বুঝতে পারছিল যে আমার যাবার সময় হয়ে আসছে।

কাল ওকে Fish Pillটা খাওয়ালাম। মহাখুশি।

আজ মাছের মুড়ো আর বড়ি পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করে দেখলাম। ও বড়িটাই খেল। আর কোন চিন্তা নেই। এবার চটপট ওর জন্য একটা পোশাক আর হেলমেট তৈরি করে ফেলতে হবে।

১০ই জানুয়ারী।

দুদিন থেকে দেখছি বিধুশেখর মাঝে মাঝে একটা গাঁ গাঁ শব্দ করছে। এটা খুবই আশ্চর্য, কারণ বিধুশেখরের তো শব্দ করার কথা নয়। কলকব্জার মানুষ, কাজ করতে বললে চুপচাপ কাজ করবে; এক নড়াচড়ার যা ঠং ঠং শব্দ। ও তো আমারই হাতের তৈরি, তাই আমি জানি ওর কতখানি ক্ষমতা। আমি জানি ওর নিজস্ব বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি বলে কিছু থাকতেই পারে না। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছি। একদিনের ঘটনা খুব বেশি করে মনে পড়ে।—

আমি তখন সবে রকেটের পরিকল্পনাটা করছি। জিনিসটা যে কোনো সাধারণ ধাতু দিয়ে তৈরি হতে পারে না সেটা প্রথমেই বুঝেছিলাম। অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করার পর, ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস আর কচ্ছপের ডিমের খোলা মিশিয়ে একটা কমপাউণ্ড তৈরি করেছি, এবং বেশ বুঝতে পারছি যে এবার হয় ট্যানট্রাম বোরোপ্যাক্সিনেট, না হয় একুইয়স ভেলোসিলিকা মেশালেই ঠিক জিনিসটা পেয়ে যাব।

প্রথমে ট্যানট্রামটাই দেখা যাক ভেবে এক চামচ ঢালতে যাব এমন সময় ঘরে একটা প্রচণ্ড খটাং খটাং শব্দ আরম্ভ হল। চমকে গিয়ে পিছন ফিরে দেখি বিধুশেখরের লোহার মাথাটা ভীষণ ভাবে এপাশ ওপাশ হচ্ছে এবং তাতেই আওয়াজ হচ্ছে। খুব জোর দিয়ে বারণ করতে গেলে মানুষে যে ভাবে মাথা নাড়ে ঠিক সেই রকম। কী হয়েছে দেখতে যাব মনে করে ট্যানট্রামটা যেই হাত থেকে নামিয়েছি অমনি মাথা নাড়া থেমে গেল।

কাছে গিয়ে দেখি কোন গোলমাল নেই। কলকব্জা তেলটেল সবই ঠিক আছে। টেবিলে ফিরে এসে আবার যেই ট্যানট্রামটা হাতে নিয়েছি অমনি আবার খটাং খটাং।

এ তো ভারী বিপদ! বিধুশেখর কি সত্যিই বারণ করছে নাকি?

এবার ভেলোসিলিকাটা হাতে নিলাম। নিতেই আবার সেই শব্দ। কিন্তু এবার মাথা নড়ছে উপর নিচে—ঠিক যেমন করে মানুষে হ্যাঁ বলে।

শেষ পর্যন্ত ভেলোসিলিকা মিশিয়েই ধাতুটা তৈরি হল।

পরে ট্যানট্রামটা দিয়েও পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। না করলেই ভালো ছিল। সেই চোখ ধাঁধানো সবুজ আলো আর বিস্ফোরণের বিকট শব্দ কোনদিনও ভুলব না।

১১ই জানুয়ারী।

আজ বিধুশেখরের কলকব্জা খুলে ওকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করেও ওর আওয়াজ করার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। তবে এও ভেবে দেখলাম যে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি আগেও অনেকবার দেখেছি যে আমার বৈজ্ঞানিক বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে আমি যেসব জিনিস তৈরি করি, সেগুলো অনেক সময়েই আমার হিসেবের বেশি কাজ করে। তাতে এক এক সময় মনে হয়েছে যে হয়তো বা কোন অদৃশ্য শক্তি আমার অজ্ঞাতে আমার উপর খোদকারি করছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বরঞ্চ আমার মনে হয় যে আমার ক্ষমতার দৌড় যে ঠিক কতখানি তা হয়তো আমি নিজেই বুঝতে পারি না। খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের শুনেছি এরকম হয়।

আর একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। সেটা হচ্ছে, বাইরের কোন জগতের প্রতি আমার যেন একটা টান আছে। এই টানটা লিখে বোঝানো শক্ত। মাধ্যাকর্ষণের ঠিক উল্টো কোন শক্তি যদি কল্পনা করা যায়, তাহলে এটার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। মনে

হয় যেন পৃথিবীর প্রভাব ছাড়িয়ে যদি কিছুদূর উপরে উঠতে পারি, তাহলেই এই টানটা আপনা থেকেই আমাকে অন্য কোন গ্রহে টহে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

এ টানটা যে চিরকাল ছিল তা নয়। একটা বিশেষ দিন থেকে এটা আমি অনুভব করে আসছি। সেই দিনটার কথা আজও বেশ মনে আছে।

বারো বছর আগে। আশ্বিন মাস। আমি আমার বাগানে একটা আরামকেদারায় শুয়ে শরৎকালের মৃদু মৃদু বাতাস উপভোগ করছি। আশ্বিন কার্তিক মাসটা আমি রোজ রাত্রে খাবার পরে তিন ঘণ্টা এইভাবে শুয়ে থাকি, কারণ এই দুটো মাসে উল্কাপাত হয় সবচেয়ে বেশি। এক ঘণ্টায় অন্তত আট দশটা উল্কা রোজই দেখা যায়। আমার দেখতে ভারী ভালো লাগে।

সেদিন কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা উল্কা দেখলাম যেন একটু অন্যরকম। সেটা ক্রমশ বড় হচ্ছে, এবং মনে হল যেন আমার দিকেই আসছে। আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। উল্কাটা ক্রমে ক্রমে কাছে এসে আমার বাগানের পশ্চিম দিকের গোলঞ্চ গাছটার পাশে থেমে একটা প্রকাণ্ড জোনাকির মতো জ্বলতে লাগল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য!

আমি উল্কাটাকে ভালো করে দেখব বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতেই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

এটাকে স্বপ্ন বলেই বিশ্বাস করতাম, কিন্তু দুটো কারণে খটকা রয়ে গেল। এক হল ওই আকর্ষণ, যেটার বশে আমি তার পরদিন থেকেই রকেটের বিষয় ভাবতে শুরু করি।

আর এক হল ওই গোলঞ্চ গাছ। সেইদিন থেকেই গাছটাতে গোলঞ্চর বদলে একটা নতুন রকমের ফুল হচ্ছে। এরকম ফুল কেউ কোথাও দেখেছে কিনা জানি না। আঙুলের মতো পাঁচটা করে ঝোলা ঝোলা পাপড়ি। দিনের বেলায় কুচকুচে কালো, কিন্তু রাত হলেই ফসফরাসের মতো জ্বলতে থাকে। আর যখন হাওয়ায় দোলে

তখন ঠিক মনে হয় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

১২ই জানুয়ারী।

কাল ভোর পাঁচটায় মঙ্গলযাত্রা।

আজ প্রহ্লাদকে ল্যাবরেটরিতে ডেকে এনে ওর পোশাক আর হেলমেটটা পরিয়ে দেখলাম। ও তো হেসেই অস্থির। সত্যি কথা বলতে কি, আমারও ওর চেহারাটা ও হাবভাব দেখে হাসি পাচ্ছিল। এমন সময় একটা ঠং ঠং ঘং ঘং শব্দ শুনে দেখি বিধুশেখর তার লোহার চেয়ারটায় বসে দুলছে আর গলা দিয়ে একটা নতুন রকম শব্দ করছে। এই শব্দের মানে একটাই হতে পারে। বিধুশেখরও প্রহ্লাদকে দেখে হাসছিল।

নিউটন হেলমেটটা পরানোর সময় একটু আপত্তি করেছিল। এখন দেখছি বেশ চুপচাপ আছে, আর মাঝে মাঝে জিভ বার করে হেলমেটের কাঁচটা চেটে চেটে দেখছে।

২১শে জানুয়ারী।

আমরা সাতদিন হল পৃথিবী ছেড়েছি। এবার যাত্রায় কোন বাধা পড়ে নি। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রওনা হয়েছি।

যাত্রী এবং মালপত্র নিয়ে ওজন হল পনেরো মন বত্রিশ সের তিন ছটাক। পাঁচ বছরের মতো রসদ আছে সঙ্গে। নিউটনের এক-একটা Fish Pillএ সাত দিনের খাওয়া হয়ে যায়। আমার আর প্রহ্লাদের জন্য বটফলের রস থেকে যে বড়িটা তৈরি করেছিলাম—বটিকা ইণ্ডিকা—কেবল মাত্র সেইটাই নিয়েছি। বটিকা ইণ্ডিকার একটা হোমিওপ্যাথিক বড়ি খেলেই পুরো চব্বিশ ঘণ্টার জন্য খিদে তেষ্টা মিটে যায়। একমন বড়ি সঙ্গে আছে।

নিউটনের এত ছোট জায়গায় বেশিক্ষণ বন্ধ থেকে অভ্যাস নেই, তাই বোধ হয় প্রথম কদিন একটু ছটফট করছিল। কাল থেকে দেখছি আমার টেবিলের উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরের দৃশ্য

দেখছে। কুচকুচে কালো আকাশ, তার মধ্যে অগণিত জ্বলন্ত গ্রহ নক্ষত্র। নিউটন দেখে আর মাঝে মাঝে আস্তে লেজের ডগাটা নাড়ে। ওর কাছে বোধ হয় ওগুলোকে অসংখ্য বেড়ালের চোখের মতো মনে হয়।

বিধুশেখরের কোন কাজকর্ম নেই, ও চুপচাপ বসে থাকে। ওর মন বা অনুভূতি বলে যদি কিছু থেকেও থাকে সেটা ওর গোল গোল বলের মতো নিষ্পলক কাঁচের চোখ দেখে বোঝবার কোন উপায় নেই।

প্রহ্লাদের দেখছি বাইরের দৃশ্য সম্পর্কে কোন কৌতূহলই নেই, ও বসে বসে কেবল রামায়ণ পড়ে। ভাগ্যে বাংলাটা শিখেছিল আমার কাছে!

২৫শে জানুয়ারী।

বিধুশেখরকে বাংলা শেখাচ্ছি। বেশ সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে, তবে ওর চেষ্টা আছে। প্রহ্লাদ যে ওর উচ্চারণের ছিরি দেখে হাসে, সেটা ও মোটেই পছন্দ করে না! দু একবার দেখেছি ও মুখ দিয়ে গঁ গঁ আওয়াজ করছে আর পা দুটো ঠং ঠং করে মাটিতে ঠুকছে। ওর লোহার হাতের একটা বাড়ি খেলে যে কী দশা হবে সেটা কি প্রহ্লাদ বোঝে না?

আজ বিধুশেখরকে পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন লাগছে?'

ও প্রশ্নটা শুনে দু তিন সেকেণ্ড চুপ করে থেকে হঠাৎ দুলতে আরম্ভ করল, কিছুক্ষণ সামনে পিছনে দুলে তারপর হাত দুটোকে পরস্পরের কাছে এনে ঠং ঠং করে তালির মতো বাজাল। দু পায়ে খানিকটা সোজা হয়ে উঠে ঘাড়টাকে চিত করে বলল, 'গাগ্‌গোঃ।'

ও যে আসলে বলতে চাচ্ছিল, 'ভালো', সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আজ মঙ্গলগ্রহটাকে একটা বাতাবিলেবুর মতো দেখাচ্ছে। আমার হিসেব অনুযায়ী আর এক মাস পরে ওখানে পৌঁছব। এই ক মাস নির্বিঘ্নে কেটেছে। প্রহ্লাদ রামায়ণ শেষ করে মহাভারত ধরেছে।

আজ সকালে দূরবীন দিয়ে গ্রহটাকে দেখছি এমন সময় খেয়াল হল বিধুশেখর কী জানি বিড়বিড় করছে। প্রথমে মন দিই নি, তারপর লক্ষ্য করলাম যে বেশ লম্বা একটা কথা বারবার বলছে। প্রতিবার একই কথা। আমি সেটা খাতায় নোট করে নিলাম, এই রকম দাঁড়াল ঃ

'ঘঙো ঘাংঙ কুঁক্ক ঘঙা আগাঁকেকেই ককুং ঘঙা।'

লেখাটা পড়ে এবং ওর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম ও কী বলছে। কিছুদিন আগে দ্বিজু রায়ের একটা গান গুনগুন করে গাইছিলাম, এটা তারই প্রথম লাইন—'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।'

বিধুশেখরের উচ্চারণের প্রশংসা করতে না পারলেও, ওর স্মরণ-শক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

জানালা দিয়ে এখন মঙ্গলগ্রহ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আস্তে আস্তে গ্রহের গায়ের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে আসছে। কাল এই সময়ে ল্যাণ্ড করব। অবিনাশবাবুর ঠাট্টার কথা মনে পড়লে হাসি পায়।

আমাদের যে সমস্ত জিনিস সঙ্গে নিয়ে নামতে হবে সেগুলো গুছিয়ে রেখেছি—ক্যামেরা, দূরবীন, অস্ত্রশস্ত্র, ফার্স্ট এড বক্স, এই সবই নিতে হবে।

মঙ্গলগ্রহে যে প্রাণী আছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তবে তারা যে কী রকম—ছোট কি বড়, হিংস্র না অহিংসক—তা জানি না। একেবারে মানুষের মতো কিছু হবে সেটাও অসম্ভব বলে মনে হয়। যদি বিদঘুটে কোন প্রাণী হয় তা হলে প্রথমটা ভয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে আমরা যেমন তাদের

কখনো দেখিনি, তারাও কখনও মানুষ দেখে নি।

প্রহ্লাদকে দেখলাম তার কোন ভয় ভাবনা নেই। সে দিব্যি নিশ্চিন্ত আছে। তার বিশ্বাস গ্রহের নাম যখন মঙ্গল তখন সেখানে কোন অনিষ্ট হতেই পারে না। আমিও ওর সরল বিশ্বাসে—

তখন ডায়রি লিখতে লিখতে এক কাণ্ড হয়ে গেল। বিধুশেখরকে কদিন থেকেই একটু চুপচাপ দেখছিলাম, কেন তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এখনো প্রশ্ন করলে ঠিক উত্তর দিতে পারে না, কেবল কোন একটা কথা বললে সেটা শুনে নকল করার চেষ্টা করে।

আজ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কী যে হল, এক লাফে যন্ত্রপাতির বোর্ডটার কাছে উঠে গিয়ে যে হ্যাণ্ডেলটা টানলে রকেটটা উলটো দিকে যায় সেইটা ধরে প্রচণ্ড এক টান! আমরা তো ঝাকুনির চোটে সব কেবিনের মেঝেয় গড়াগড়ি।

কোনমতে উঠে গিয়ে বিধুশেখরের কাঁধের বোতামটা টিপতেই ও বিকল হয়ে হাত পা মুড়ে পড়ে গেল। তারপর হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে মোড় ফিরিয়ে আবার মঙ্গলের দিকে যাত্রা।

বিধুশেখরের এরকম পাগলামির কারণ কী? ওকে আপাতত অকেজো করেই রেখে দেব। ল্যাণ্ড করবার পর আবার বোতাম টিপে চালু করব। আমার বিশ্বাস ওর 'মনের' উপর চাপ পড়েছিল বেশি, বড্ড বেশি কথা বলা হয়েছে ওর সঙ্গে, তাই বোধহয় ওর 'মাথাটা' বিগড়ে গিয়েছিল।

আর পাঁচ ঘণ্টা আছে আমাদের ল্যাণ্ড করতে। গ্রহের গায়ে যে নীল জায়গাগুলোকে প্রথমে জল বলে মনে হয়েছিল, সেটা এখন অন্য কিছু বলে মনে হচ্ছে। সরু সরু লাল সুতোগুলো যে কী এখনও বুঝতে পারছি না।

আমরা দু ঘণ্টা হল মঙ্গলগ্রহে নেমেছি। একটা হলদে রঙের নরম 'পাথরের' ঢিপির উপরে বসে আমি ডায়রি লিখছি। এখানে গাছপালা মাটি পাথর সবই কেমন জানি নরম নরম রবারের মতো।
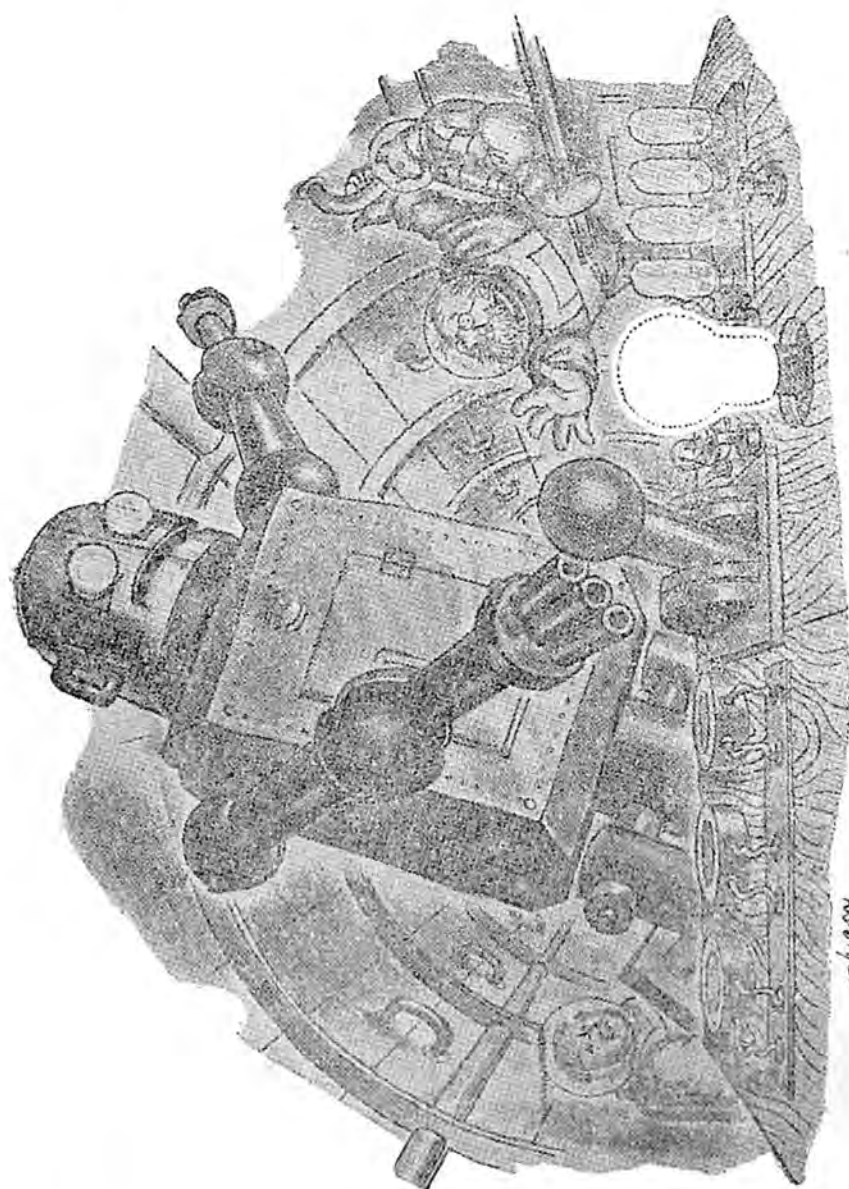
সেইটা ধরে প্রচণ্ড এক টান

সামনেই হাত বিশেক দূরে একটা লাল নদী বয়ে যাচ্ছে। সেটাকে প্রথমে নদী বলে বুঝি নি কারণ 'জল'টা দেখলে ঠিক মনে হয় যেন স্বচ্ছ পেয়ারার জেলি। এখানে সব নদীই বোধহয় লাল। এবং সেগুলোকেই আকাশ থেকে লাল সুতোর মতো দেখায়। যেটাকে রকেট থেকে জল বলে মনে হয়েছিল সেটা আসলে ঘাস আর গাছ-পালা—সবই সবুজের বদলে নীল। আকাশের রং কিন্তু সবুজ, তাই সব কী রকম উলটো উলটো মনে হয়।

এখন পর্যন্ত কোন প্রাণী চোখে পড়ে নি। আমার হিসেব তা হলে ভুল হল নাকি? কোন সাড়াশব্দও পাচ্ছি না! কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। এক নদীর জলের কুলকুল শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই নেই; আশ্চর্য নিস্তব্ধতা।

ঠাণ্ডা নেই; বরঞ্চ গরমের দিকেই। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একটা হাওয়া আসে, সেটা ক্ষণস্থায়ী হলেও একেবারে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। দূরে হয়তো বরফের পাহাড় টাহাড় জাতীয় কিছু আছে।

নদীর জলটা প্রথমে পরীক্ষা করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। তারপর নিউটনকে খেতে দেখে ভরসা পেলাম। আঁজলা করে তুলে চেখে দেখি অমৃত! মনে পড়ল একবার গারো পাহাড়ে একটা ঝরনার জল খেয়ে আশ্চর্য ভালো লেগেছিল। কিন্তু এর কাছে সে জল কিছুই না। এক ঢোঁক খেয়েই শরীর ও মনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

বিধুশেখরকে নিয়ে আজও এক ফ্যাসাদ। ওর যে কী হয়েছে জানি না। রকেট ল্যাণ্ড করার পর বোতাম টিপে ওকে চালু করে দিলাম, কিন্তু ও নড়েও না চড়েও না। জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে তুমি নামবে না?'

ও মাথা নেড়ে না বলল।

বললাম, 'কেন, কী হয়েছে?'

এবার বিধুশেখর হাত দুটো মাথার উপর তুলে গম্ভীর ভয় পাওয়া

গলায় বলল, 'বিভং।'

বিধুশেখরের ভাষা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হয় না। তাই বুঝলাম ও বলছে 'বিপদ'। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বিপদ বিধুশেখর ? কিসের ভয় ?'

বিধুশেখর আবার গম্ভীর গলায় বলল, 'বিভং, ভীবং বিভং।'

বিপদ। ভীষণ বিপদ।

অগত্যা বিধুশেখরকে রকেটে রেখেই আমরা তিনটি প্রাণী মঙ্গল-গ্রহের মাটিতে পদার্পণ করলাম।

প্রথম পরিচয়ের অবাক ভাবটা এই দু ঘণ্টার মধ্যেই অনেকটা কেটে গেছে। নতুন জগতের যে একটা গন্ধ থাকতে পারে সেটা ভাবতে পারি নি। রকেট থেকে নেমেই সেটা টের পেলাম। এটা গাছপালা জলমাটির গন্ধ নয়—কারণ আলাদা করে প্রত্যেকটা জিনিস শুঁকে দেখেছি। এটা মঙ্গলগ্রহেরই গন্ধ, আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে রয়েছে। হয়তো পৃথিবীরও একটা গন্ধ রয়েছে যেটা আমরা টের পাই না, কিন্তু অন্য কোন গ্রহের লোক সেখানে গেলেই পাবে।

প্রহ্লাদ পাথর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে বলেছি কোন প্রাণী-টানী দেখলে আমায় খবর দিতে।

একদিকের আকাশে দেখছি সবুজ রঙের লালের ছোপ পড়েছে। এখন তা হলে বোধহয় ভোর, শিগগিরই সূর্য উঠবে।

মঙ্গল গ্রহের বিভীষিকা মন থেকে দূর হতে কতদিন লাগবে জানি না। কী করে যে প্রাণ নিয়ে বাঁচলাম সেটা ভাবতে এখনো অবাক লাগে। মঙ্গল যে কত অমঙ্গল হতে পারে, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

ঘটনাটা ঘটল প্রথম দিনেই।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি টিলার উপর থেকে উঠে জায়গাটা দিনের আলোয় একটু ভালো করে ঘুরে দেখব ভাবছি। এমন সময় একটা আঁশটে গন্ধ আর একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। ঠিক

মনে হল যেন একটা বেশ বড় রকমের ঝিঁঝি 'তিন্তিড়ি তিন্তিড়ি' বলে ডাকছে। আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে সেটা বুঝবার চেষ্টা করছি এমন সময় একটা বিকট চিৎকারে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

তারপর দেখলাম প্রহ্লাদকে, তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ডান হাতের মুঠোয় নিউটনকে ধরে উর্ধ্বশ্বাসে এক এক লাফে বিশ-পঁচিশ হাত করে রকেটের দিকে চলেছে।

তার পিছু নিয়েছে যে জিনিসটা সেটা মানুষও নয় জন্তুও নয়, মাছও নয় কিন্তু তিনের সঙ্গেই কিছু কিছু মিল আছে। লম্বায় তিন হাতের বেশি নয়, পা আছে, কিন্তু হাতের বদলে মাছের মতো ডানা, বিরাট মাথায় মুখজোড়া দন্তহীন হাঁ, ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সবুজ চোখ, আর সর্বাঙ্গে মাছের মতো আঁশ সকালের রোদে চিকচিক করছে।

জন্তুটা ভালো ছুটতে পারে না, পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। তাই হয়তো প্রহ্লাদের নাগাল পাবে না।

আমার যেটা সবচেয়ে সাংঘাতিক অস্ত্র সেটা হাতে নিয়ে আমি জন্তুটার পিছনে রকেটের দিকে ছুটলাম, প্রহ্লাদের যদি অনিষ্ট হয় তা হলেই অস্ত্রটা ব্যবহার করব, নয়তো প্রাণিহত্যা করব না।

আমি যখন জন্তুটার থেকে বিশ কি পঁচিশ গজ দূরে, তখনই প্রহ্লাদ রকেটে উঠে পড়েছে। কিন্তু এবারে আর এক কাণ্ড। বিধুশেখর একলাফে রকেট থেকে নেমে জন্তুটাকে রুখে দাঁড়াল।

ব্যাপার দেখে আমিও থমকে দাঁড়ালাম। এমন সময় একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে আবার সেই আঁশটে গন্ধটা পেয়ে ঘুরেই দেখি ঠিক ওইটার মতো আরো অন্তত দু তিন শ জন্তু দূর থেকে দুলতে দুলতে রকেটের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের মুখ দিয়ে সেই বিকট ঝিঁঝির শব্দ—'তিন্তিড়ি। তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি। তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি!—'

বিধুশেখরের লোহার হাতের এক বাড়িতেই জন্তুটা 'চীঁ' শব্দ করে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাটিতে পড়ে গেল। পাছে ও রোখের মাথায় একাই ওই মঙ্গলীয় সৈন্যকে আক্রমণ করে, তাই

দৌড়ে গিয়ে বিধুশেখরকে জাপটে ধরলাম। কিন্তু ওর গোঁ সাংঘাতিক আমায় শুদ্ধ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে জন্তুগুলোর দিকে এগিয়ে চলল। আমি কোনমতে কাঁধের কাছে হাতটা পৌঁছিয়ে বোতামটা টিপে দিলাম, বিধুশেখর অচল হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এদিকে মঙ্গলীয় সৈন্য এখন একশ গজের মধ্যে। তাদের আঁশটে গন্ধে আমার মাথা ঘুরছে। ভৌতিক তিন্তিড়ি চিৎকারে কান ভোঁ ভোঁ করছে।

এখন এই পাঁচ মনি যন্ত্রের মানুষটাকে রকেটে ওঠাই কী করে?

প্রহ্লাদকে ডেকে উত্তর পেলাম না।

কী বুদ্ধি হল, হাত দিয়ে বিধুশেখরের কোমরের কবজাটা খুলতে লাগলাম। বুঝতে পারছি মঙ্গলীয় সৈন্যের ঢেউ দুলতে দুলতে ক্রমশই এগিয়ে আসছে। আড়চোখে চেয়ে দেখি এখন প্রায় হাজার জন্তু, রোদ পড়ে তাদের আঁশের চকচকানিতে প্রায় চোখ ঝলসে যায়।

কোনমতে বিধুশেখরকে দু ভাগে ভাগ করে ফেলে তার মাথার অংশটা টানতে টানতে রকেটের দরজার সামনে এনে ফেললাম। এবার পায়ের দিকটা। সৈন্য এখন পঞ্চাশ গজের মধ্যে। আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে। অস্ত্রের কথা ভুলে গিয়েছি।

পা ধরে টানতে টানতে বিধুশেখরের তলার অংশটা যখন রকেটের দরজায় এনে ফেলাম, তখন দেখি প্রহ্লাদের জ্ঞান হয়েছে। সে এরই মধ্যেই ওপরের দিকটা ক্যাবিনের ভিতর তুলে দিয়েছে।

বাকি অংশটা ভিতরে তুলে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করার ঠিক আগের মুহূর্তে আমার পায়ে একটা ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেতে ঝাপটা অনুভব করলাম।

তারপর আর কিছুই মনে ছিল না।

যখন জ্ঞান হল দেখি রকেট উড়ে চলেছে। আমার ডান পায়ে একটা চিনচিনে যন্ত্রণা ও ক্যাবিনের মধ্যে একটা মেছো গন্ধ এখনো রয়ে গেছে।

কিন্তু রকেটটা উড়ল কী করে? চালাল কে? প্রহ্লাদ তো
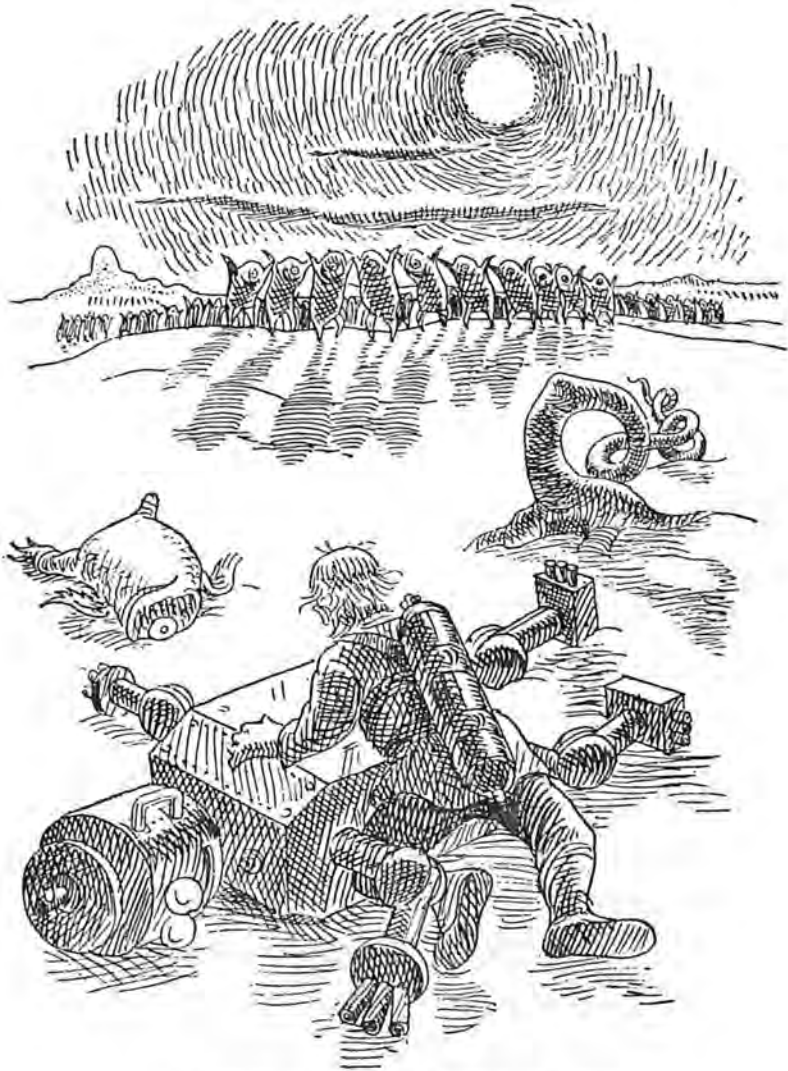
বিধুশেখর অচল হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল

যন্ত্রপাতির কিছুই জানে না। আর বিধুশেখর তো এখনো দুখান হয়ে পড়ে আছে। তবে কি আপনিই উড়ল নাকি? কিন্তু তাই যদি হয় তবে কোথায় চলেছে এই রকেট? কোথায় যাচ্ছি আমরা? সৌরজগতের অগণিত গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে কোনটিতে গিয়ে আমাদের পাড়ি শেষ হবে? শেষ কি হবে, না অনির্দিষ্ট কাল আমাদের এইভাবে আকাশপথে অজানা উদ্দেশে ঘুরে বেড়াতে হবে?

কিন্তু রসদ? সে তো অফুরন্ত নয়। আর তিন বছর পরে আমরা খাব কী?

রকেটের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে দেখেছি, তার কোনটাই কাজ করছে না। এই অবস্থায় রকেটের চলবারই কথা নয়। কিন্তু তাও আমরা চলেছি। কী করে চলেছি জানি না, কিছুই জানি না।

মনে অসংখ্য প্রশ্ন গিজগিজ করছে। কিন্তু কোনটারই উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই।

আজ থেকে আমি অজ্ঞান, অসহায়।

ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়, অন্ধকার।

এখনও আমরা একইভাবে উড়ে চলেছি।

কিছু দেখবার নেই, তাই জানলাটা বন্ধ করে রেখেছি।

প্রহ্লাদ এখন অনেকটা সামলে নিয়েছে। দাঁতকপাটি লাগাটাও কমেছে। নিউটনের অরুচিটাও কমেছে। মঙ্গলীয়র গায়ে দাঁত বসানোর ফলেই বোধহয় ওটা হয়েছিল। কাণ্ডই বটে! প্রহ্লাদের কথাবার্তা এখনো অসংলগ্ন, কিন্তু যেটুকু বলেছে তার থেকে বুঝেছি যে নদীর ধারে পাথর কুড়োতে কুড়োতে সে হঠাৎ একটা আঁশটে গন্ধ পায়। তাতে সে মুখ তুলে দেখে কিছু দূরেই একটা না-মানুষ-না-জন্তু-না-মাছ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আর নিউটন লেজ খাড়া করে চোখ বড় বড় করে গুটি গুটি সেটার দিকে এগোচ্ছে। প্রহ্লাদ কিছু করার আগেই নিউটন নাকি এক লাফে

জন্তুটার কাছে গিয়ে তার হাঁটুতে এক কামড় দেয়। তাতে সেটা ঝিঁঝির মত এক বিকট চিৎকার করে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই নাকি ঠিক ওই রকম আরেকটা জন্তু কোথা থেকে এসে প্রহ্লাদকে তাড়া করে। তার পরের ঘটনা অবিশ্যি আমার নিজের চোখেই দেখা।

বিধুশেখর আশ্চর্য সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। তাই খুশি হয়ে এ কদিন আমি ওকে বিশ্রাম দিয়েছি। আজ সকালে প্রহ্লাদ ও আমি ওকে জোড়া দিয়ে ওর কাঁধের বোতামটা টিপে দিতেই ও স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

তারপর থেকেই ও আমার সঙ্গে বেশ পরিষ্কারভাবে প্রায় মানুষের মত কথা বলছে। কিন্তু কেন জানি না ও চলতি ভাষা না বলে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করছে। বোধহয় এতদিন প্রহ্লাদের মুখে রামায়ণ মহাভারত শোনার ফল!

আর সময়ের হিসেব নেই। সন তারিখ সব গুলিয়ে গেছে। রসদ আর কয়েক দিনের মত আছে। শরীর মন অবসন্ন। প্রহ্লাদ আর নিউটন নির্জীবের মত পড়ে আছে। কেবল বিধুশেখরের কোন গ্লানি নেই। ও বিড়বিড় করে সেই কবে প্রহ্লাদের মুখে শোনা ঘটোৎকচ বধের অংশটা আবৃত্তি করে যাচ্ছে।

আজও সেই ঝিমধরা ভাবটা নিয়ে বসে ছিলাম, এমন সময় বিধুশেখর হঠাৎ তার আবৃত্তি থামিয়ে বলে উঠল, 'বাহবা, বাহবা, বাহবা।'

আমি বললাম, 'কী হল বিধুশেখর, এত ফুর্তি কিসের?'

বিধুশেখর বলল, 'গবাক্ষ উদ্ঘাটন করহ।'

এর আগে বিধুশেখরের কথা না শুনে ঠকেছি। তাই হাত বাড়িয়ে জানালাটা খুলে দিলাম। খুলতেই এক চোখঝলসানো দৃশ্য আমায় কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ করে দিল। যখন দৃষ্টি ফিরে পেলাম, দেখি আমরা এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য জগতের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছি। যতদূর চোখ যায় আকাশময় কেবল বুদ্‌বুদ্, ফুটছে আর

ফাটছে, ফুটছে আর ফাটছে। এই নেই এই আছে, এই আছে এই নেই।

অগুনতি সোনার বল আপনা থেকে বড় হতে হতে হঠাৎ ফেটে সোনার ফোয়ারা ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমি যে অবাক হব তাতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু প্রহ্লাদ যে প্রহ্লাদ, সেও এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে নি। আর নিউটন? সে ক্রমাগত ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জানালার কাঁচটা খামচাচ্ছে, পারলে যেন কাঁচ ভেদ করে বাইরে চলে যায়।

সেদিন থেকে আর জানালা বন্ধ করি নি। কারণ কখন যে কোন বিচিত্র জগতের মধ্যে এসে পড়ি তার ঠিক নেই। খিদেতেষ্টা ভুলে গেছি। ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য পরিবর্তন হচ্ছে। এখন দেখছি সারা আকাশময় সাপের মত কিলবিলে সব আলো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। এক একটা জানালার খুব কাছে এসে পড়ে, আর ক্যাবিনের ভেতরটা আলো হয়ে ওঠে। এ যেন সৌরজগতের কোন বাদশাহের উৎসবে আতসবাজির খেলা।

আজকের অভিজ্ঞতা এক বিধুশেখর ছাড়া আমাদের সকলের ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল।

আকাশভর্তি বিশাল বিশাল গোলাকৃতি এবড়োখেবড়ো পাথরের চাঁই। তাদের গায়ে সব গহ্বরের ভিতর থেকে অগ্ন্যুদগার হচ্ছে। আমরা সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে কলিশন বাঁচিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছি। প্রহ্লাদ ক্রমাগত ইষ্টনাম জপ করছে। নিউটন টেবিলের তলায় ঢুকে থরথর করে কাঁপছে। কতবার মনে হয়েছে এই বুঝি গেলাম, এই বুঝি গেলাম। কিন্তু রকেট ঠিক শেষ মুহূর্তে ম্যাজিকের মত মোড় ঘুরে নিজের পথ বেছে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

আমরা ভয়ে মরছি, কিন্তু বিধুশেখরের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তার চেয়ারে বসে দুলছে ও মধ্যে মধ্যে 'টাফা' 'টাফা' বলছে।

এই একটা নতুন কথা কদিনই ওর মুখে শুনছি। বোধ হয়

বাইরের দৃশ্য দেখে তারিফ করে 'তোফা' কথাটা বলতে গিয়ে টাফা বলছে।

আজ নিউটনকে বড়ি খাওয়াচ্ছি এমন সময় বিধুশেখর হঠাৎ এক লাফে জানালার কাছে গিয়ে 'টাফা' বলে চিৎকার করে উঠল। আমি জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি—আকাশে আর কিচ্ছু নেই, কেবল একটা ঝলমলে সাদা গ্রহ নির্মল নিষ্কলঙ্ক একটি চাঁদের মত আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

রকেটটা নিঃসন্দেহে ওই গ্রহটার দিকেই এগিয়ে চলেছে। বিধুশেখরের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ওটার নাম টাফা।

আজ জানালা দিয়ে অপূর্ব দৃশ্য। টাফার সর্বাঙ্গে যেন অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। সেই আলোয় আমাদের ক্যাবিনও আলো হয়ে গেছে। আমার সেই স্বপ্নের জোনাকির কথা মনে পড়ছে। মন আজ সকলেরই খুশি।

শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের অভিযান ব্যর্থ হবে না।

টাফার দূরত্ব দেখে আন্দাজে মনে হচ্ছে কালই হয়তো আমরা ওখানে পৌঁছে যাব। গ্রহটা যে ঠিক কী রকম দেখতে সেটা ওই জোনাকিগুলোর জন্য বোঝবার উপায় নেই।

আজ বিধুশেখর যে সব কথাগুলো বলছিল সেগুলো বিশ্বাস করা কঠিন। আমি কদিন থেকেই ওর অতিরিক্ত ফুর্তি দেখে বুঝেছি যে ওর 'মাথা'টা হয়তো আবার গোলমাল করছে।

ও বলল টাফায় নাকি সৌরজগতের প্রথম সভ্য লোকেরা বাস করে। পৃথিবীর সভ্যতার চেয়ে ওদের সভ্যতা নাকি বেশ কয়েক কোটি বছরের পুরোনো। ওদের প্রত্যেকটি লোকই নাকি বৈজ্ঞানিক, এবং এত বুদ্ধিমান লোক একসঙ্গে হওয়াতে নাকি ওদের অনেকদিন থেকেই অসুবিধে হচ্ছে। তাই কয়েক বছর থেকেই নাকি ওরা অন্যান্য সব গ্রহ থেকে একটি করে কমবুদ্ধি লোক বেছে নিয়ে টাফায় আনিয়ে বসবাস করাচ্ছে।

আমি বললাম, 'তাহলে ওদের প্রহ্লাদকে পেয়ে খুব সুবিধে হবে

বল।' তাই শুনে বিধুশেখর ঠং ঠং করে হাততালি দিয়ে এমন বিশ্রীরকম অট্টহাসি আরম্ভ করল যে আমি বাধ্য হয়ে তার কাঁধের বোতামটা টিপে দিলাম।

কাল টাফায় পৌঁছেছি। রকেট থেকে নেমে দেখি বহু লোক আমায় অভ্যর্থনা করতে এসেছে। 'লোক' বলছি, কিন্তু এরা আসলে মোটেই মানুষের মত নয়। অতিকায় পিঁপড়েজাতীয় একটা কিছু কল্পনা করতে পারলে এদের চেহারার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। বিরাট মাথা, আর চোখ, কিন্তু সেই অনুপাতে হাত পা সরু—যেন কোন কাজেই লাগে না। এদের সম্বন্ধে বিধুশেখর যা বলেছিল তা যে একদম ভুল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা আসলে ঠিক তার উলটো। অর্থাৎ এরা মানুষের অবস্থা থেকে এখনো অনেক পিছিয়ে আছে, এবং সে অবস্থায় পৌঁছতে ঢের সময় লাগবে।

টাফার অবস্থা যে পৃথিবীর তুলনায় কত আদিম তা এতেই বেশ বোঝা যায় যে, এদের ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই—এমন কি গাছপালাও নেই। এরা গর্ত দিয়ে মাটির ভিতর ঢুকে যায় এবং সেখানেই বাস করে। অবিশ্যি আমাকে এরা ঠিক আমার দেশের বাড়ির মত একটা বাড়ি দিয়েছে। কেবল ল্যাবরেটরিটাই নেই, আর সবই যেমন ছিল ঠিক তেমনি।

প্রহ্লাদ ও নিউটন দিব্যি আছে। নতুন গ্রহে এসে নতুন পরিবেশে যে বাস করছে সে বোধটাই যেন নেই।

বিধুশেখরকেই কেবল দেখতে পাচ্ছি না, ও কাল থেকেই উধাও। টাফা সম্পর্কে এতগুলো মিথ্যে কথা বলে হয়তো আর মুখ দেখানোর সাহস নেই।

আজ থেকে ডায়রি লেখা বন্ধ করব—কারণ এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। খাতাটা পৃথিবীতে ফেরত পাঠানোর কোন উপায় নেই, এটা খুব আক্ষেপের বিষয়। এত মূল্যবান তথ্য রয়েছে এতে! এখানকার মূর্খরা তো এর মর্ম কিছুই

বুঝবে না—আর এদিকে আমাকেও ফিরে যেতে দেবে না।

ফিরে যাওয়ার খুব যে একটা প্রয়োজন বোধ করছি তাও নয়—কারণ এরা সত্যি আমায় খুবই যত্নে রেখেছে। বোধ হয় ভাবছে যে আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করে নেবে।

এরা বাংলাটা জানল কী করে জানি না—তবে তাতে একটা সুবিধে হয়েছে যে ধমকটমক দিলে বোঝে। সেদিন একটা পিঁপড়েকে ডেকে বললাম, 'কই হে, তোমাদের বৈজ্ঞানিক-টৈজ্ঞানিকেরা সব কোথায়? তাদের সঙ্গে একটু কথাটথা বলতে দাও। তোমরা যে ভয়ানক পিছিয়ে আছ।'

তাতে লোকটা বলল, 'ওসব বিজ্ঞান-টিজ্ঞান দিয়ে আর কী হবে? যেমন আছেন থাকুন না। আমরা মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসব। আপনার সহজ সরল কথাবার্তা শুনতে আমাদের ভারী ভালো লাগে।'

আহা! যত সব ন্যাকামো।

আমি রেগে গিয়ে আমার নস্যির বন্দুকটা নিয়ে লোকটার ঠিক নাকের ফুটোয় তাগ করে মারলাম।

কিন্তু তাতে ওর কিছু হল না।

হবে কী করে? এরা যে এখনো হাঁচতেই শেখে নি।

[অনেকে হয়তো জানতে চাইবে প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রিটা কোথায় এবং এমন আশ্চর্য জিনিসটাকে দেখবার কোন উপায় আছে কি না। আমার নিজের ইচ্ছে ছিল যে, ডায়রিটা ছাপানোর পর ওর কাগজ ও কালিটা কোন বৈজ্ঞানিককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তারপর ওটাকে যাদুঘরে দিয়ে দেব। সেখানে থাকলে অবিশ্যি সকলের পক্ষেই দেখা সম্ভব হবে। কিন্তু তা হবার জো নেই। না-থাকার কারণটাও আশ্চর্য। লেখাটা কপি করে প্রেসে দেবার পর সেই দিনই বাড়ি এসে শোবার ঘরের তাক থেকে ডায়রিটা নামাতে গিয়ে দেখি জায়গাটা ফাঁকা। তারপর এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। ডায়রির পাতার কিছু গুঁড়ো আর লাল মলাটটার ছোট্ট

একটা অংশ তাকের উপর পড়ে আছে। এবং তার উপর ক্ষিপ্রপদে ঘোরাফেরা করছে প্রায় শ-খানেক বুভুক্ষু ডেঁয়োপিঁপড়ে। এরা পুরো খাতাটাকে খেয়ে শেষ করেছে, এবং এই সামান্য বাকি অংশটুকু আমার চোখের সামনেই উদরসাৎ করে ফেলল। আমি কেবল হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

যে জিনিসটাকে অক্ষয় অবিনশ্বর বলে মনে হয়েছিল, সেটা হঠাৎ পিঁপড়ের খাদ্যে পরিণত হল কী করে সেটা আমি এখনও ভেবে ঠাহর করতে পারি নি। তোমরা এর মানে কিছু বুঝতে পারছ কি ?]

প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়

[বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু বেশ কয়েক বছর যাবৎ নিখোঁজ। তাঁর একটি ডায়রি কিছুদিন আগে আকস্মিকভাবে আমাদের হাতে আসে। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' নাম দিয়ে আমরা সেটি সন্দেশে ছাপিয়েছি। ইতিমধ্যে আমি অনেক অনুসন্ধান করে অবশেষে গিরিডিতে গিয়ে তাঁর বাড়ির সন্ধান পাই, এবং তাঁর কাগজপত্র, গবেষণার সরঞ্জাম সব কিছুরই হদিস পাই। কাগজপত্রের মধ্যে আরো একুশখানা ডায়রি পাওয়া গেছে। তার কয়েকটি আমি পড়েছি, অন্যগুলো পড়ছি। প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। তার মধ্যে একটি নিচে দেওয়া হল। ভবিষ্যতে আরো দেওয়ার ইচ্ছে আছে।]

৭ই মে, শুক্রবার।

নীলগিরির পাদদেশে একটি গুহার মধ্যে বসে পেট্রোম্যাক্সের আলোতে আমার ডায়রি লিখছি। গুহার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত এবড়ো থেবড়ো পাথরের ঢিপি। গাছপালা বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না—তবে গুহার সামনেই রয়েছে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ।

আমাদের কাছেই, গুহার প্রায় অর্ধেকটা জায়গা জুড়ে পড়ে আছে হাড়ের স্তূপ—গত সতেরো দিনের অক্লান্ত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল। প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার সম্বন্ধে আমি যতদূর পড়াশুনা করেছি, তাতে মনে হয় এ জানোয়ার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এর আয়তন বিশাল। পায়ের পাতা সাড়ে তিন ফুট। পাঁজরের মধ্যে দুজন মানুষ অনায়াসে বাস করতে পারে। সামনের পা দুটো কিন্তু ছোট—কতকটা যেন টিরানোসরাসের মতো। লেজ আছে—বেশ লম্বা ও মোটা। সবচেয়ে মজা হল—দুটো ছোট ছোট ডানারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—যদিও এত বড় শরীরে অতটুকু ডানায় ওড়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

হাড়গুলো সরিয়ে এনে একত্র করা ছিল রীতিমত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। স্থানীয় টোডারা অনেক সাহায্য করেছে। নাহলে একা প্রহ্লাদের সাহায্যে আমি আর কতটুকুই বা করতে পারতাম? অথচ বিরাট তোড়জোড় করে ঢাক পিটিয়ে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি বরাবরই নিরিবিলি কাজ করতে ভালোবাসি। তাছাড়া এ ব্যাপারে তো কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। নীলগিরির এদিকটায় প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হাড় থাকতে পারে এমন একটা ইঙ্গিত অবিশ্যি আগেই পেয়েছিলাম—কিন্তু এসব ব্যাপারে তো নিশ্চয়তা বলে কিছুই নেই! অনেক বড় বড় প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানও ব্যর্থ হয়েছে বলে শুনেছি।

এখানে বলা দরকার আমার হাড় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার উৎসটা কী; কবে, কীভাবে এ নেশা আমাকে পেয়ে বসল। আমি আসলে বৈজ্ঞানিক—পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আমার কারবার; সেখানে প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে হঠাৎ এত মেতে উঠলাম কেন?

এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আমার জীবনে তিন বছরের আগেকার ঘটনায় ফিরে যেতে হয়—যে ঘটনা আমার নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। আমি বিকেলে আমার বৈঠকখানায় বসে কফি খাচ্ছি, এমন সময় অবিনাশবাবু এসে হাজির। আমার গবেষণা নিয়ে অবিনাশবাবুর ঠাট্টাগুলো আমার মোটেই ধাতে সয় না, কিন্তু আজ তাঁর মুখ বন্ধ করার মতো অস্ত্র আমার হাতে ছিল।

আমি আমার নতুন গাছের একটি ফল তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম।

অবিনাশবাবু সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বললেন, 'ও বাবা —এমন ফল তো দেখি নি! গন্ধ আমের মতো—আবার ঠিক আমও নয়। আকারে গোল—কতকটা কমলার মতো অথচ একেবারে মসৃণ —দানাটানা কিচ্ছু নেই।'

আমি বললুম, 'ছুরি দিচ্ছি, কেটে খেয়ে দেখুন।'

অবিনাশবাবু এক কামড় খেয়েই একেবারে থ! বললেন, 'আহাহা—এ যে অতি উপাদেয় ফল মশাই! এ কি দিশি না বিলিতি? পেলেন কোথায়? এর নাম কী?'

অবিনাশবাবুকে বাগানে নিয়ে গিয়ে আমার 'আমলা' বা Mangorange গাছ দেখিয়ে দিলাম। এ গাছ আমার গত এক বছরের সাধনার ফল। বললাম, 'এবারে দুটোর বেশি ফল মিক্স করে দেখছি। স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টি—সব দিক দিয়েই আশ্চর্য নতুন সব ফল আবিষ্কার করার সম্ভাবনা রয়েছে।'

বৈঠকখানায় ফিরে এসে সোফায় বসতেই অবিনাশবাবু বললেন, 'এই দেখুন ফলের ঝামেলায় আসল কথাটাই বলা হয় নি—যেটা বলার জন্যে আসা। শ্মশানটা পেরিয়ে একটা শিমুলগাছ আছে দেখেছেন তো? সেইটেয় এক সাধু এসে আস্তানা গেড়েছেন।'

'সেইটেয় মানে? সেই গাছটায়?'

'হ্যাঁ। গাছের ডাল ধরে ঝুলে যোগসাধনা করেন ইনি। পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকেন, হাত দুটোও ঝুলে থাকে। এইটেই নাকি এঁর অভ্যাস।'

'যত সব বুজরুকি!'

সাধু সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে আমার ভক্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এদের মধ্যে বুজরুকের সংখ্যাই যে বেশি তার প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি।

অবিনাশবাবু কিন্তু আমার কথা শুনে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। আমার টেবিলটা চাপড়ে কফির পেয়ালাটাকে প্রায় ফেলে দিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না মশাই—বুজরুকি না। সাধুটির সঞ্জীবনীমন্ত্র জানা আছে।'

'কিরকম?'

'কিরকম আবার? জন্তুজানোয়ারের কঙ্কাল এনে ফেলে দিলে মন্ত্রের জোরে সেগুলোকে রক্ত মাংস দিয়ে আবার জ্যান্ত করে

ফেলেন! প্রথম দিন একটা শেয়ালকে জ্যান্ত করেন। আমার চাকর বাঞ্ছারাম নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে এসে আমার কাছে রিপোর্ট করে। শুনেটুনে আমিও প্রথমটা তাকে একটু ধমকধামক দিয়ে বিকেলের দিকে আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে নিজেই গেসলুম। গিয়ে কী দেখলুম জানেন? ননী ঘোষের একটা বাছুর বুঝি মাসখানেক আগে রেল লাইনের ওদিকটায় চরতে গেসল। সেই-খানেই সাপের কামড়টা খেয়ে ওটা বুঝি মরে পড়ে ছিল। শকুনিতে তার মাংস খেয়ে হাড়টুকু রেখে গেসল। এক রাখাল ছোকরা সেই হাড় দেখতে পায়। সাধুবাবার কীর্তির কথা শুনে সে দেখি হাড়গুলো এনে গাছের তলায় রেখেছে। আর সাধুবাবা সেই ঝোলা অবস্থাতেই দেখি হাড়ের স্তূপের দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে আর চোখ পাকাচ্ছে। তারপর দেখি বাঁ হাতটা তুলে সটান পশ্চিম দিকে পয়েণ্ট করে ডান হাতটা নিচের দিকে বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে মুখ দিয়ে কী জানি বিড়বিড় করছে। বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই—চোখের সামনে দেখলুম সে হাড়ের উপর কোত্থেকে মাংস চামড়া লোম খুর সব লেগে গিয়ে বাছুরটা যেন ঘুম ভেঙে তড়াক করে উঠে হাম্বা হাম্বা বলে দে ছুট! বড় বড় ম্যাজিশিয়ান শুনেছি একসঙ্গে অনেকগুলো লোককে হিপনটাইজ করতে পারে। কিন্তু এখানে তাই বা হয় কী করে? এই তো আসবার সময়ও দেখে এলাম সেই বাছুরকে—দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। তাই ভাবলুম, আপনার তো এসব ব্যাপারে বিশ্বেস টিশ্বেস নেই—আপনাকে যদি একবার দেখিয়ে আনতে পারি, বেশ রগড় হয়! যাবেন নাকি একবার শ্মশানের দিকটায়?'

অবিনাশবাবু মিথ্যে বলছেন কিনা সেটা ওঁর সঙ্গে না গিয়ে বোঝার কোনো উপায় নেই। ভেবে দেখলাম, মিথ্যে হলে বড় জোর ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট হবে। যাই না, ঘুরে আসি!

উশ্রীর ধারে শ্মশান পেরিয়ে যখন শিমুলগাছটার কাছে পৌঁছলাম তখন সূর্য ডুবতে আর মিনিট পনেরো বাকি।

সাধুবাবার চেহারা যে ঠিক এমনটি হবে তা আমি অনুমান

করিনি। গায়ের রং মিশকালো, লম্বায় প্রায় ছ ফুট, চুল দাড়ি কাঁচা এবং ঘন, বয়স বোঝার কোনো উপায় নেই। শিমুলগাছের ডালে পা দিয়ে যেভাবে ঝুলে আছেন সাধুবাবা, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেভাবে বেশিক্ষণ থাকলে মাথায় রক্ত উঠে মৃত্যু অনিবার্য। অথচ এই লোকটির চেহারায় অসোয়াস্তির কোনো লক্ষণ নেই। বরং ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসির ভাব রয়েছে বলেই মনে হল।

সাধুটিকে ঘিরে জনা পঞ্চাশেক লোকের ভিড়। বোধহয় হাড়ের খেলার তোড়জোড় চলেছে।

অবিনাশবাবু ভিড় ঠেলে আমাকে সঙ্গে করে এগিয়ে গেলেন। এবারে দেখতে পেলাম, সাধুটির মাথার ঠিক নীচেই বেড়ালের সাইজের কোনো জানোয়ারের হাড় স্তূপ করে রাখা হয়েছে। সাধু তাঁর দুহাত একত্র করে দশটি আঙুল সেই হাড়ের দিকে তাগ করে রেখেছেন। হঠাৎ এক বিকট হুংকার দিয়ে সাধুবাবা দুলতে আরম্ভ করলেন— তাঁর দৃষ্টি হাড়ের স্তূপের উপর নিবদ্ধ। অবিনাশবাবু আমার কোটের আস্তিনটা চেপে ধরলেন।

এখানে বলে রাখি—হিপনটিজম নিয়ে বিস্তর গবেষণা আমি এককালে করেছি, এবং একথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে এমন কোনো জাদুকর পৃথিবীতে নেই যে আমায় হিপনটাইজ করতে পারে। ওয়ালী, ম্যাক্সিম দি গ্রেট, ফ্যাবুলিনো, জন শ্যামরক ইত্যাদি পৃথিবীর সেরা সব জাদুকর নানান কৌশল করেও আমাকে হিপনটাইজ করতে পারে নি। বরং উলটে একবার তো সেই চেষ্টায় রাশিয়ান জাদুকর জেবুলস্কি নিজেই ভিরমি গেলেন। যাই হোক, আসল কথা হল—সাধুবাবা যদি সম্মোহনের আশ্রয় নেন, তাহলে আমার কাছে এঁর বুজরুকি ধরা পড়তে বাধ্য।

মিনিটখানেক দোলার পর সাধুবাবা স্থির হলেন। তারপর লক্ষ্য করলাম সাধুবাবার সমস্ত শরীরে একটা কম্পন আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু সে কম্পন এতই মৃদু যে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তা ধরাই পড়বে না।

এবার হাড়গুলোর দিকে চাইতে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলাম। হাড়গুলির মধ্যেও যেন একটা অতি অল্প, কিন্তু অতি দ্রুত স্পন্দনের লক্ষণ, এবং সেই স্পন্দনের ফলে হাড়ে হাড় লেগে একটা অতি মিহি খট খট শব্দ,—শীতকালে দাঁতে দাঁত লেগে যেমন শব্দ হয় কতকটা সেই রকম।

আমি অবিনাশবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে করে বললাম, 'লোকটা মন্তর-টন্তর আওড়ায় না?'

অবিনাশবাবু ঠোটে তর্জনী ঠেকিয়ে বললেন, 'সবুর করুন—মেওয়া ফলবে এক্ষুনি।'

এক্ষুনি না হলেও, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। নদীর ওপারের জঙ্গল থেকে সবেমাত্র শেয়াল ডেকে উঠছে, এমন সময় দেখি সাধুবাবা তাঁর বাঁ হাতটা উঁচিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে নির্দেশ করছেন। আর ডান হাত বাঁই বাঁই করে ইলেকট্রিক পাখার মত ঘোরাতে আরম্ভ করেছেন। তারপর আরম্ভ হল মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ। এটাই যদি সঞ্জীবনীমন্ত্র হয় তাহলে অবিশ্যি তা অনুধাবন করা মানুষের অসাধ্য। গ্রামোফোনের স্পীড অসম্ভব বাড়িয়ে দিলে সুর যেমন চড়ে যায়; আর কথা যেমন দ্রুত হয়ে যায় এ যেন সেই রকম ব্যাপার। এত তীক্ষ্ণ উঁচু স্বর আর এমন দ্রুত বিড়বিড়োনি যে মানুষের পক্ষে সম্ভব তা জানতাম না।

আবার চোখ গেল হাড়গুলোর দিকে।

আমি বৈজ্ঞানিক। এরপর চোখের সামনে যা ঘটল তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা জানি না। হয়তো আছে। হয়তো আমাদের বিজ্ঞান এখনও এ সবের কুলকিনারা করতে পারে নি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো পারবে। কিন্তু যা দেখলাম তা এতই জলজ্যান্ত পরিষ্কার যে সেটা অবিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

যা ছিল আলগা কতগুলো হাড়, তা এক নিমেষে প্রথমে জায়গায় জায়গায় জোড়া লেগে গেল—অর্থাৎ মাথার জায়গায় মাথা,

পাঁজরের জায়গায় পাঁজর, পায়ের জায়গায় পা, ইত্যাদি, এবং তার উপর দেখতে দেখতে এল মাংস রক্ত স্নায়ু ধমনী চামড়া লোম নখ চোখ এবং সবশেষে—প্রাণ, আর প্রাণ আসার সঙ্গে সঙ্গেই হাড়ের জায়গায় একটি ফুটফুটে সাদা খরগোশ মিটমিট করে এদিক ওদিক চেয়ে কান দুটোকে বার কয়েক নাড়া দিয়ে এক লাফে লোকজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।···

গভীর চিন্তা ও বিস্ময় নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। অবিনাশবাবুর কাছে এই প্রথম আমার নতি স্বীকার করতে হল। আমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার আগে ভদ্রলোক বেশ শ্লেষের সঙ্গেই বললেন, 'পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় তো দেখলেন মশাই। বিশ বছর ধরে অ্যাসিড ম্যাসিড ঘেঁটে হাতটাত পুড়িয়ে তো বিস্তর নাজেহাল হলেন। এবার এইসব ছেলেখেলা বন্ধ করে আমার সঙ্গে আলুর চাষে নেমে পড়ুন।'

পরের দিন দেখলাম আমার নিজের কাজে মন বসছে না। মন চলে যাচ্ছে বারবার ওই শ্মশানঘাটে শিমুলগাছের দিকে। দুদিন কোনোরকমে নিজেকে সামলে রেখে তৃতীয় দিনের দিন চলে গেলাম আবার সাধুদর্শনে। তারপরের দিনও আবার গেলাম। প্রথম দিনে কুকুর ও দ্বিতীয় দিনে একটি চন্দনাকে কঙ্কাল অবস্থা থেকে পুনর্জীবন পেতে দেখলাম। কুকুরটা নাকি পাগল হয়ে মরেছিল—জ্যান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মোতি ধোপার পায়ে এক কামড় বসিয়ে দিল! আর চন্দনাটা সটান শিমুলগাছের মগডালে উঠে 'রাধাকিষন' 'রাধাকিষন' বলে ডাকতে আরম্ভ করল।

আমি অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম।

আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মন্ত্রটার কোনো কুলকিনারা করতে পারলাম না; অথচ ওটিকে দন্তস্ফুট করে বিশ্লেষণ করলে হয়তো রহস্যের কিছুটা সমাধান হতে পারত।

পরের দিন বিকেলের দিকে ভাবতে ভাবতে আমার মাথায় এক এক ফন্দি এল যেটার চমৎকারিত্ব আমি নিজেই তারিফ না করে

পারলাম না।

আমার তো রেকর্ডিং যন্ত্র রয়েছে, এই দিয়ে কোনোরকমে লুকিয়ে মন্ত্রটাকে রেকর্ড করে রাখা যায় না? আলবত যায়, এবং সেটা করতে হবে এক্ষুনি। শুভস্য শীঘ্রম। সাধুবাবা কোনদিন অন্তর্ধান হবেন তার কি ঠিক আছে?

পরদিন অমাবস্যা। আমার রেকর্ডিং যন্ত্রের মাইক্রোফোনটি আকারে একটি দেশলাই-এর বাক্সের মতো। তার সঙ্গে একটা লম্বা তার জুড়ে মাঝরাত্রে গেলাম শ্মশানঘাটে শিমুলগাছের কাছে।

গিয়ে দেখি সাধুবাবার খ্যাতি এমনই ছড়িয়েছে যে এত রাত্রেও জনা ত্রিশেক লোক গাছটার নিচে অর্থাৎ সাধুবাবার নিচে জটলা করে রয়েছে। এতে একদিক দিয়ে আমার কাজের সুবিধেই হল। আমিও ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে গাছের গুঁড়িটাকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করার ভাব করে এক ফাঁকে টুক করে গুঁড়ির একটা ফাটলের ভিতর মাইক্রোফোনটাকে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর তারের অন্য মুখটা গাছ থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে একটা কেয়াঝোপের পিছনে লুকিয়ে রেখে দিলাম।

পরদিন হনুমান মিশ্রের একটা ছাগল জ্যান্ত করার সময় আমার যন্ত্রে সাধুবাবার মন্ত্রটি রেকর্ড হয়ে গেল।

যন্ত্রটি হাতে নিয়ে সন্ধ্যের দিকে যখন চোরের মতো বাড়ি ফিরলাম তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েচে। প্রহ্লাদকে গরম কফি বানানোর আদেশ দিয়ে আমি আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকলাম। দু-এক ঝলক বিদ্যুতের চমক ও কিছু মেঘগর্জনের পর বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠল। আমি জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে রেকর্ডারটা টেবিলের উপর রেখে তারটা দেয়ালের প্লাগে লাগিয়ে দিলাম। আমার মতলব ছিল, প্রথমে সাধারণ স্পীডে মন্ত্রটা বার কয়েক শুনে তারপর অর্ধেক স্পীডে সেটাকে চালাব। তাহলেই মন্ত্রটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে। বিজ্ঞানের কাছে এইখানেই ত্রিকালজ্ঞ সাধুবাবাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে।

সদ্য আনা গরম কফিতে একটা চুমুক দিয়ে রেকর্ডারের স্যুইচটা টিপে দিতেই বাদামি রঙের ম্যাগনেটিক টেপ ঘুরতে আরম্ভ করল। 'বলো হরি হরিবোল।' মনে পড়ল সাধুবাবার মন্ত্রোচ্চারণের কিছু আগেই একটি মড়া এসে পৌঁছেছিল শ্মশানঘাটে। এ তারই শব্দ।

তারপর এল শেয়ালের ডাক। তারপর এই সেই তক্ষকের ডাক। এইবার শুনব সেই মন্ত্র।

এই তো সেই তীক্ষ্ণ স্বর, সেই বিদ্যুদ্বেগে বিড়বিড়ানি—ঠিক কানে যেমনটি শুনেছি—অবিকল সেই রকম।

কিন্তু এ কী? যন্ত্র হঠাৎ থেমে গেল কেন!

আর এই বিকট অট্টহাসি কার? এ তো আমার রেকর্ড করা কোনো হাসির শব্দ নয়। এ যে আমার ঘরের পাশেই

আমার চোখ চলে গেল পুবের জানালার দিকে। জানালার বাইরে আমার বাগান, এবং বাগানে গোলঞ্চগাছ।

বিদ্যুতের এক ঝলক আলোয় দেখলাম সেই গোলঞ্চগাছের ডাল থেকে ঝুলে আছে শ্মশানের সেই সাধুবাবা—তাঁর তীক্ষ্ণ হিংস্র দৃষ্টি আমার রেকর্ডার যন্ত্রের উপর নিবদ্ধ।

ব্যাপারটা আমার কাছে এতই অস্বাভাবিক মনে হল যে আমি ভয় না পেয়ে সোজা জানালার কাছে গিয়ে সেটাকে এক ঠেলায় খুলে দিলাম।

কিন্তু কোথায় সে সাধুবাবা? গাছ রয়েছে, গাছের পাতা বৃষ্টির জলে চিক চিক করছে, কিন্তু সাধুবাবা উধাও, অদৃশ্য।

ভুল দেখলাম নাকি?

কিন্তু চোখ, কান দুইই কি একসঙ্গে এমন ভুল করতে পারে! হাসিও যে শুনলাম সাধুবাবার—গলার স্বর তো চেনা হয়ে গেছে এই তিন দিনে।

যাকগে—ভেলকিই হোক, আর সত্যিই হোক, চলেই যখন গেছে তখন আর ভেবে লাভ কী? তার চেয়ে বরং যন্ত্রটা চালানোর চেষ্টা করা যাক।

আশ্চর্য—এবার সুইচ টিপতেই দেখি যন্ত্র চলছে। কিন্তু শ্মশানের সেই সব শব্দ কোথায় গেল ? মন্ত্রই বা কোথায় গেল ?

মন্ত্রের বদলে এই বিকট হাসি রেকর্ড হয়ে গেল কী করে ?

বাধ্য হয়েই মনে মনে স্বীকার করতে হল যে কোনো অলৌকিক শক্তির বলে সাধুবাবাজী আমার গোপন অভিসন্ধির কথা টের পেয়ে আমার প্রচেষ্টা ভণ্ডুল করে দিয়েছেন।

সঞ্জীবনীমন্ত্রটি আয়ত্ত করার আর কোনো উপায় নেই।

পরদিন অবিনাশবাবু এসে বললেন, 'শিমুলগাছে ট্রু লেট টাঙানো রয়েছে দেখে এলুম। সাধুবাবা পগার পার।'

যেমন আকস্মিকভাবে এসেছিলেন, তেমনই আকস্মিকভাবে চলে গেছেন সাধুবাবা। রেখে গেছেন শুধু তাঁর বিকট হাসি, আর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত কিছু পাখি আর জানোয়ার।

আরো একটি জিনিসকে সাধুবাবার দান বলেই বলব—সেটা হল হাড় সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসা। হাড়ের নেশা এর পর থেকেই আমাকে পেয়ে বসে। আমার বাড়ির যে ঘরটা খালি পড়ে ছিল কয়েক মাসের মধ্যেই নানান পশুপক্ষীর কঙ্কাল দিয়ে সেটা ভরাট হয়ে যায়। হাড় সম্বন্ধে যা কিছু পড়ার তা পড়ে ফেলি। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তার সবের মধ্যেই যে একটা অস্থিগত সাদৃশ্য আছে তা জেনে একটা অদ্ভুত মনোভাব হয় আমার। যাবতীয় প্রাণীর কঙ্কালের প্রতি একটা বিচিত্র আকর্ষণ আমি অনুভব করতে থাকি। এক রকম চশমাও আমি আবিষ্কার করি যার মধ্য দিয়ে দেখলে জীবন্ত প্রাণীর রক্তমাংস না দেখে কেবল তার কঙ্কালটাই দেখতে পাওয়া যায়।

এই হাড় থেকেই জাগে প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার সম্পর্কে কৌতূহল। অবিশ্যি এই দুইএর মাঝখানে রয়েছেন শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গম দেশিকাচার শেষাদ্রি আয়াঙ্গার, বা সংক্ষেপে মিস্টার আয়াঙ্গার। এখানের অভ্রের খনিতে কাজ নিয়ে আসেন এই মিস্টার আয়াঙ্গার। ব্যাঙ্গালোরবাসী অমায়িক যুবক ব্রাহ্মণ। আমার

সঙ্গে আলাপ উশ্রীর ধারে। বেশ লাগল ভদ্রলোকটিকে। গণিতজ্ঞ পণ্ডিত লোক—তাই কথা বলে বেশ আরাম পাওয়া যায়।

তাঁর বাড়িতেই একদিন বিকেলে চা খেতে গিয়ে বৈঠকখানার উপর দেখলাম এক অতিকায় গোড়ালি অর্থাৎ কোনো অতিকায় জানোয়ারের গোড়ালির হাড়।

হাড়টা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'নীলগিরিতে এক বন্ধুর চা-বাগানে ছুটিতে গিয়েছিলাম। কাছাকাছি পাহাড়ে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন ওই হাড়টা পাই। হাতি না গণ্ডার? বলুন তো কিসের হাড়?'

মুখে বললুম, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।' মনে মনে বললুম, তুমি গণিতজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু অস্থিবিদ্‌ নও। এ হাড় হাতিরও নয়, গণ্ডারেরও নয়! এ হাড় যে জানোয়ারের, সে জানোয়ারের অস্তিত্ব অন্তত কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে মুছে গেছে।

আমি নিজে বুঝেছিলুম—হাড়টা ব্রণ্টোসরাসের, এবং তখনই মনে মনে স্থির করেছিলুম—নীলগিরিতে একটা পাড়ি দিতেই হবে।

সেইদিন থেকে তোড়জোড় শুরু করে আজ তিন সপ্তাহ হল আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। আশ্চর্য সৌভাগ্যক্রমে, আমরা আসার চার দিন পরেই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হাড়ের সন্ধান পেয়েছি এই গুহার মধ্যে। টুকরো ইতস্তত ছড়ানো হাড় এক জায়গায় স্তূপ করে রাখতে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছে। সত্যি বলতে কী, স্থানীয় টোডাদের সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে এ কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভবই হত না।

আগেই বলেছি, এ জানোয়ার আমার অপরিচিত। শুধু আমার কেন, প্রাণিবিদ্যার জগতে এ জানোয়ারের পরিচয় কেউ জানে বলে আমার মনে হয় না। আমি স্থির করেছি আর দু এক দিনের মধ্যেই ব্যাঙ্গালোরে আমার আবিষ্কারের কথা জানিয়ে দেব। আমার একার পক্ষে এ হাড় স্থানান্তরিত করা অসম্ভব।

মাসখানেকের মধ্যেই কলকাতা কি মাদ্রাজের জাদুঘরে একটি
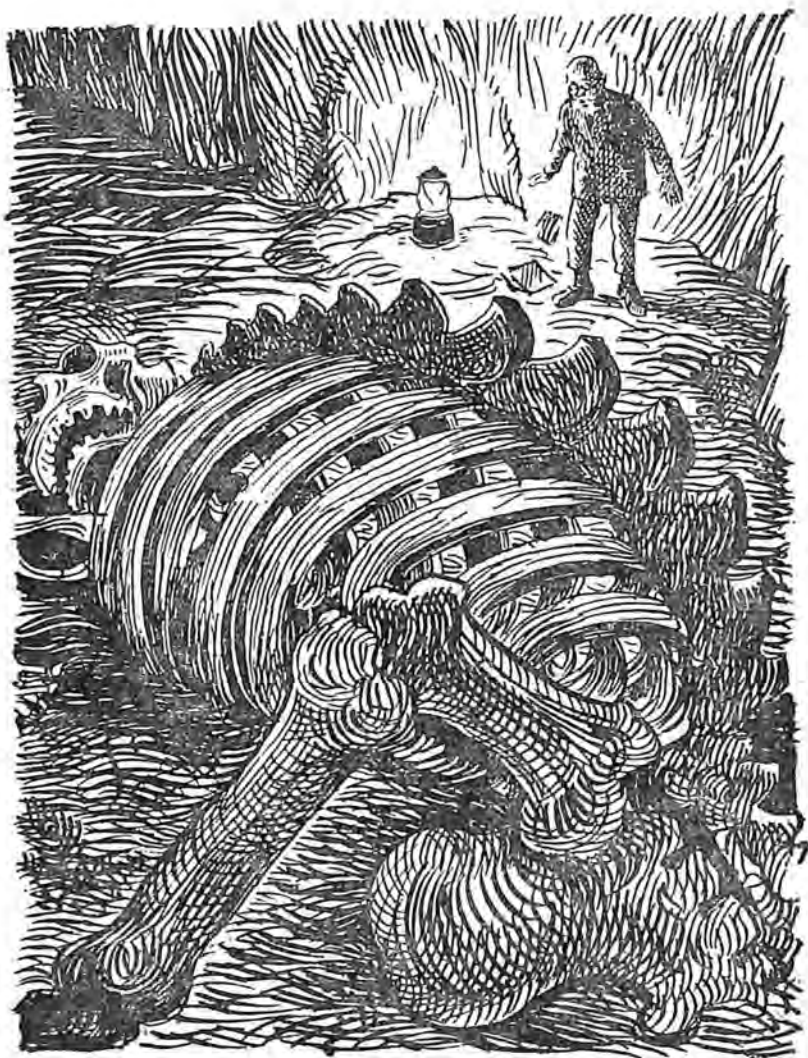
গুহার ভিতরটা বেশ আলো হয়ে উঠল

না-জানা প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কালের স্থান হলে মন্দ হয় না।···

৯ই মে, রবিবার

ব্যাঙ্গালোর স্টেশনের ওয়েইটিং রুম-এ বসে আমার ডায়রি লিখছি। গতকালের ঘটনাটার একটা যথার্থ বর্ণনা দেওয়া বৈজ্ঞানিকের চেয়ে সাহিত্যিকের পক্ষেই বোধহয় সহজ বেশি। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, অনেক বিপদ, অনেক বিভীষিকা আমার জীবনে দাগ রেখে গেছে, কিন্তু কালকের ঘটনার যেন কোনো তুলনা নেই।

কাল বিকেল অবধি আমার কাজ ছিল হাড়গুলোকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করা। এই আদ্যিকালের ধুলো ঝাড়া কি আর এক নিমেষের কাজ? এক একটি অংশ পরিষ্কার করছি, এবং সেইগুলো আমার টোডা অ্যাসিসট্যান্টদের সাহায্যে যথাস্থানে বসাচ্ছি। জন্তুর চেহারাটা যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে আসছে।

সন্ধ্যা হবার মুখটাতে টোডারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। প্রহ্লাদকে পাঠিয়ে দিলাম সঙ্গীর সন্ধানে।

আমি একা গুহার ভিতরে রয়েছি। এইবার পেট্রোম্যাক্সটা জ্বালাবার সময় হয়েছে। গুহার বাইরের অশ্বত্থগাছে পাখির কলরব থেমে গিয়ে চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব।

দেশলাইটা জ্বালাতে হঠাৎ যেন একটা খচমচ শব্দ শুনতে পেলাম। গিরগিটি বা গোসাপ জাতীয় কিছু হবে আর কি। কিন্তু টর্চের আলোতে কিছুই চোখে পড়ল না।

পেট্রোম্যাক্সটাকে জ্বালিয়ে একটা চ্যাটালো পাথরের উপর রাখতেই গুহার ভিতরটা বেশ আলো হয়ে উঠল।

সেই আলোয় হাড়গুলোর দিকে চোখ পড়তেই মনে হল সেগুলো যেন অল্প অল্প কাঁপছে।

এটা অনুভব করতেই তিন বছর আগেকার শিমুলগাছের সেই স্মৃতি আমার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়ে দিল এবং আমার চোখ চলে

গেল গুহার মুখের দিকে।

বাইরে অশথগাছের ডাল ধরে ঝুলে আছে সেই সাধুবাবা।

তার বাঁ হাত পশ্চিম দিকে তোলা, ডান হাত বনবন করে ঘুরছে, দৃষ্টি বিস্ফারিত, পেট্রোম্যাক্সের আলোতে জ্বলজ্বল চোখ করে চেয়ে আছে আমারই দিকে।

তারপরই আরম্ভ হল তীক্ষ্ণ ক্ষীণ স্বরে অতি দ্রুত লয়ে সেই অদ্ভুত অর্থহীন মন্ত্র উচ্চারণ।

কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন জোর করেই আমার দৃষ্টি সাধুর দিক থেকে ঘুরিয়ে দিল ওই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হাড়ের স্তূপের দিকে।

হাড় এখন আর হাড় নেই। তার জায়গায় এক অদৃষ্টপূর্ব অতিকায় আদিম প্রাণী সাধুবাবার অলৌকিক শক্তির বলে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হচ্ছে।

আমি এই বিপদেও আমার হাতিয়ারের কথা ভুলে গিয়ে যেই পাথরে বসেছিলাম, সেই পাথরেই পাথরের মতো বসে রইলাম। অন্তিমকালে ইষ্টনাম জপ করার চিন্তাও আমার মাথায় আসে নি। এ কথাই কেবল মনে হয়েছিল যে যদি এই মুহূর্তেও আমার মৃত্যু হয় —অন্তত এটুকু জানব যে এমন দৃশ্য দেখে মরার সৌভাগ্য আর বোধহয় কারুরই হয় নি।

প্রাণের স্পন্দন আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি জানোয়ারটির আকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নিলাম। এত পরিশ্রম করে অতীতের যে জানোয়ারের কঙ্কালের আবিষ্কর্তা এই আমি, সেই কঙ্কাল পুনরুজ্জীবিত হয়ে কি শেষটায় আমাকেই ভক্ষণ করবে?

গুহার বাইরে অশ্বত্থগাছটার দিকে একটা দ্রুত দৃষ্টি দিয়ে বুঝলাম সাধুবাবার চোখে মুখে এক পৈশাচিক উল্লাসের ভাব। আমি এককালে আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে তাঁর মন্ত্র অপহরণের চেষ্টা করেছিলাম, এবং অনেকদূর সফলও হয়েছিলাম। সাধুবাবা আজ সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত।

এক বিশাল গর্জন গুহার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার রক্ত জল করে দিল। বুঝলাম জানোয়ারের দেহে প্রাণ এসেছে।

ক্রমশ সেই পর্বতপ্রমাণ দেহ তার পিছনের দু পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল। একজোড়া জ্বলন্ত সবুজ চোখ কিছুক্ষণ আমার পেট্রো-ম্যাক্সটার দিকে চেয়ে রইল।

তারপর দেখি জন্তুটা এগোতে শুরু করেছে। তার উত্তপ্ত নিশ্বাস আমি আমার দেহে অনুভব করছি। একটা মৃদু অথচ গুরুগম্ভীর গর্জন ও লেজের দু-একটা আছড়ানিতে অনুমান করলাম জানোয়ার কোনো কারণে বিচলিত—হয়তো বিক্ষুব্ধ।

তারপর দেখলাম জানোয়ারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গুহার বাইরে অশত্থগাছটার উপর এবং পরমুহূর্তেই সে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল।

এর পরের দৃশ্য আমার জীবনের শেষদিন অবধি মনে থাকবে।

জানোয়ারটা সোজা গিয়ে অশ্বত্থগাছের একটা ডাল ধরে পাতা সমেত সেটাকে মুখে পুরে দিল।

আর সাধুবাবা? তাঁর যে অন্তিম অবস্থা উপস্থিত সেটা কি তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন? আর তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে যে তিনি তাঁর শেষ ভেলকি দেখিয়ে যাবেন, সেটা কি আমি জানতাম? জানোয়ারটা যখন ডাল ধরে নাড়া দিচ্ছে তখনই লক্ষ্য করছিলাম যে সাধুবাবার প্রায় ডালচ্যুত হবার উপক্রম। কিন্তু সেই অবস্থাতেই দেখলাম তিনি তার বাঁ হাতটি পুবদিকে তুলে ডান হাত বনবন করে ঘুরিয়ে আরেকটা কী যেন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন।

মন্ত্র শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবা গাছ থেকে মাটিতে পড়লেন এবং পরমুহূর্তেই সেই অতিকায় আদিম জানোয়ার মুখে একগুচ্ছ অশ্বত্থপাতা নিয়ে চতুর্দিক কাঁপিয়ে এক বিরাট আর্তনাদ করে কাত হয়ে পড়ল সাধুবাবার উপরেই।

তারপর দেখলাম এতদিন যা দেখেছি তার বিপরীত জাদু।

একটি আস্ত রক্তমাংসের জানোয়ার চোখের সামনে আবার অস্থির স্তূপে রূপান্তরিত হল। আর সেই বিরাট কঙ্কালের পাঁজরের ফাঁক দিয়ে দেখলাম এক নরকঙ্কাল। সাধুবাবার মৃতদেহও জানোয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই কঙ্কালে পরিণত হয়েছে।

আপনা থেকেই আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হল। রাখে কেষ্ট মারে কে? এই জানোয়ার উদ্ভিদজীবী এবং পুনর্জীবন লাভের পরমুহূর্তেই সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল বলেই সামনে আর কিছু না পেয়ে অশ্বত্থের পাতায় ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করেছে। সর্বজ্ঞ সাধুবাবার এ কথাটি জানা ছিল না। মাংসাশী হলে জানোয়ার প্রথমে আমাকেই খেত এবং তারপরেই সাধুবাবা উলটো মন্ত্র উচ্চারণ করে জানোয়ারকে আবার অস্থিতে পরিণত করে তাঁর প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করে অন্য কোনো গাছে গিয়ে আশ্রয় নিতেন!

একেই কি বলে হাড়ে হাড়ে অভিজ্ঞতা?···

প্রহ্লাদ চা এনেছে। ট্রেনও বুঝি এসে গেল। এখানেই আমার লেখা শেষ করি।

অতু

বীতশোকবাবু রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে সাধারণতঃ ছাদে একটু পায়চারি করেন—বহুদিনের অভ্যাস। আজ গরমটা একটু বেশী, তাই পায়চারির পরেও ঘরে ঢুকতে আর ইচ্ছে হল না, ঈজিচেয়ারটা ছাদে টেনে এনে তাতেই গা এলিয়ে দিলেন তিনি।

আকাশে একটুও মেঘ নেই। পরিষ্কার আকাশ ঝলমল করছে তারার আলোয়। বীতশোকবাবু শুয়ে শুয়ে তাই দেখছেন আর ভাবছেন কবে মানুষ ঐ সব তারার রাজ্যে—অন্ততঃ পক্ষে গ্রহান্তরে পৌঁছতে পারবে। কে জানে ওখানকার পরিবেশ কি রকম! সত্যিই কি কোন জীবন্ত প্রাণী ঐ সব গ্রহলোকের কোনটায় বহাল তবিয়তে বাস করছে? কে জবাব দেবে এ প্রশ্নের?

হঠাৎ হাউই বাজীর মত আকাশের এক কোণে কি একটা ঝলক দিয়ে নিমেষে মিলিয়ে গেল আর তার কয়েক সেকেণ্ড পরেই একটা বিকট শব্দে চমকে উঠলেন তিনি। কি হল? তারা খসে পড়ল? অর্থাৎ উল্কা জ্বলে গেল? কিন্তু তাতে শব্দ হবে কেন?

শহরতলীতে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বীতশোকবাবুর বাড়ী। বাড়ীর পেছনে মস্ত বাগান, আর তার পরেই একটা খাল এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে! ওদিকটা নির্জন, লোকজনের বসতি নেই বললেই চলে। কিন্তু মনে হল শব্দটা ওদিক থেকেই এল যেন।

বীতশোকবাবুর কৌতূহল হল খুব—ব্যাপারটা কি জানতে, কিন্তু অত রাত্রে জঙ্গলের দিকে যাওয়া ঠিক হবে কিনা ভেবে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন তিনি। বিশেষতঃ শব্দটা হবার পর আর কোন সোরগোল বা সাড়াশব্দ কানে এল না তাঁর।

রাত্রে ভাল ঘুম হল না। কেমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় রাতটা কাটিয়ে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে বেরিয়ে পড়লেন

গর্তের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে একটা কালো পাথরের চাঁই

তিনি। বাগান পার হয়ে খুঁজতে খুঁজতে খালের কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

একটা হিজল গাছের পাশে খানিকটা ঝোপঝাড়। কয়েকদিন থেকেই লক্ষ্য করেছেন তিনি। জায়গাটা একটু পরিষ্কার করিয়ে ওখানে কয়েকটা কলমের গাছ লাগিয়ে দেবেন মনে মনে এই রকম ইচ্ছে ছিল। কিন্তু একী কাণ্ড! জায়গাটা এমনিই পরিষ্কার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, ঝোপঝাড়গুলো তো দেখা যাচ্ছে না আর! কাছে গিয়ে দেখেন ঝোপগুলো পুড়ে গেছে, পুড়ে গেছে হিজল গাছের কয়েকটা ডালও। আর সেইখানটায় মাটির কাছে বিরাট একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। শুধু গর্তই নয়, গর্তের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে একটা কালো পাথরের চাঁই।

বীতশোকবাবু সন্তর্পণে এগিয়ে এসে সেটা স্পর্শ করলেন। অল্প অল্প গরম মনে হল। একটু নেড়েচেড়ে দেখলেন ভীষণ ভারী। তাঁর একার পক্ষে তোলা অসম্ভব। তা হলে—তা হলে সত্যিই কি কোন বড়গোছের উল্কাপাত হয়েছিল গত রাত্রে। আর সে উল্কা পড়েছে তাঁরই বাগানে! আকাশের গায়ে সেই চকিত আলোর ঝলক আর তার পরেই বিকট শব্দের কারণ এবার তাহলে বোঝা গেল। বিরাট আকারের ছিল এই উল্কাটা, তাই আকাশপথে ছুটবার সময় পুরোটা পুড়তে পারেনি। তারই খানিকটা জ্বলন্ত টুকরো ছিটকে এসে পড়েছে এই বাগানে। আশপাশের গাছপালা পুড়িয়ে, মাটিতে গর্ত করে ঢুকে গেছে তার মধ্যে। তারপর সারা রাত ধরে ঠাণ্ডা হয়েছে কিন্তু, তবু, এতক্ষণেও তার গরম ভাবটা যায় নি।

বীতশোকবাবু তাড়াতাড়ি ছুটে ফিরে গেলেন বাড়ীতে। লোক-জন ডেকে এনে এখনই তুলতে হবে ওটাকে।

বিরাট ভারী উল্কাপিণ্ডটা, ওজন পাঁচ ছ মণ তো হবেই, বেশীও হতে পারে। আর হবেই বা না কেন? এগুলোর মধ্যে লোহাই যে থাকে বেশী, নিকেল প্রভৃতি অন্য ধাতুও থাকতে পারে। অবশ্য তা ছাড়াও অল্প পরিমাণে থাকে এটা ওটা সেটা। তবে এতবড়

উল্কাপিণ্ড সচরাচর পাওয়া যায় না। কাজেই বীতশোকবাবু যে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠবেন এ তো সহজেই বোঝা যায়।

সবাই মিলে অনেক কসরৎ করে ওটাকে তুলে উল্টে ফেলা হল। বীতশোকবাবু ঝুঁকে পড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

জমাট কালো রং-এর মাঝে মাঝে ছাই রং-এর ছোপ, একটা দিক দেখতে অনেকটা গ্র্যানাইট পাথরের মত। আর তারই মধ্যে—

হঠাৎ চমকে উঠলেন বীতশোকবাবু। কি একটা জিনিস যেন নড়ে বেড়াচ্ছে!

বাগানের গর্ত থেকেই কিছু বেরিয়ে এসেছে কি? নাঃ, দেখে তো তা মনে হয় না। যে ভাবে উল্কাপিণ্ডটার সঙ্গে লেপ্টে ছিল এতক্ষণ তাতে তো মনে হয় বরাবর ওটা ওরই মধ্যে ছিল। অবশ্য আগে নড়ছিল না। কোন জীবন্ত প্রাণী কি? কিন্তু জ্বলন্ত উল্কার আগুনের মধ্যে থেকেও কোন প্রাণী বেঁচে থাকবে—পুড়ে ছাই হয়ে যাবে না এ তো আর সম্ভব নয়! ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক মনে হচ্ছে তা হলে।

ততক্ষণে সূর্য উঠেছে। তারই খানিকটা আলো এসে পড়েছে ওর গায়। এবারে বেশী চক্‌চক্ করছে জিনিসটা। প্রথম প্রথম পাঁশুটে মনে হচ্ছিল, এখন রোদ পড়ে সাদাটে লাগছে। আশেপাশের রং থেকে একেবারেই আলাদা, কি হতে পারে ওটা?

বীতশোকবাবু এবার সাহসে ভর করে আঙুল দিয়ে জিনিসটা টিপে দেখলেন। নিরেট পাথরের মতই শক্ত মনে হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাণ্ড ঘটল। ঐ সাদা জিনিসটার গায়ে হাত দিতেই ওটা স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে দুপা এগিয়ে গেল।

এবার আর চিনতে ভুল হল না। সত্যি একটা জ্যান্ত প্রাণী, কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার তার চেহারা। পরিচিত কোন প্রাণীর সঙ্গেই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আকারে বড় জোর একটা চড়াই পাখীর মত হবে; মুখটা ঈষৎ ছুঁচলো, তার ভিতর চক্‌চক্ করছে

দুসারি খুদে খুদে দাঁত। গোল গোল দুটি চোখও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কিন্তু তাতে দৃষ্টিশক্তি আছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ছোট ছোট অনেকগুলি পা, কিন্তু দেখতে সেগুলো পায়ের মত নয়—ঠিক যেন ট্যাঙ্কের চাকা—এবড়োখেবড়ো জায়গা দিয়ে চলে বেড়াবার মত করেই তৈরী হয়েছে সেগুলো। পৃথিবীর কোন জীব যে সে নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। সেই পায়ের নীচে আবার কতগুলি ছোট ছোট গোল গোল গুটির মত কি লেগে রয়েছে!

বীতশোকবাবু জীবটিকে সযত্নে তুলে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। শুরু হল তার তোয়াজ। বিরাট মহাকাশের কোন্ অজানা গ্রহের বাসিন্দা ছিল সে কেউ জানে না, কিন্তু পৃথিবীতে সে একটা পরম বৈজ্ঞানিক বিস্ময়। তাকে যে ভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কাগজে কাগজে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। নানা জায়গা থেকে টেলিগ্রাম আসতে লাগল। বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে, চিড়িয়াখানার কর্তাদের কাছ থেকে—'যে করেই হোক এই আশ্চর্য জীবটিকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমরা সাধ্যমত সাহায্য করছি।' বীতশোকবাবু সকলেরই সাহায্য নেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু জীবটিকে কাছছাড়া করতে রাজী হলেন না।

জন্তুটার একটা নাম তো দিতেই হবে। বীতশোকবাবু বললেন, 'ও হচ্ছে মহাকাশ থেকে আসা আমাদের পৃথিবীর অতিথি, ওকে ঐ রকম একটা নাম দেওয়াই ঠিক হবে।'

বীতশোকবাবুর ছোট শালা জুলজিতে অনার্স নিয়ে বি, এস্-সি পড়ে, সে বললে, 'না জামাইবাবু, ওর একটা বৈজ্ঞানিক নাম দিতে হবে—যেমন নিয়ম,—ল্যাটিন নাম। আমি আমাদের স্যরের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে বলে দেব; দুদিন সবুর করুন।'

ওঁর বড় ভায়রা ভাই রসিক লোক, তিনি বললেন, 'আবার স্যরের কি দরকার, আমিই বলে দিচ্ছি। নাম রাখা যাক ম্যোহাকাশিয়াম অ্যাটিঠেয়াম। ল্যাটিন ঘেঁষাও হবে, আবার বীতশোকের ইচ্ছাও পূরণ হবে।

'তার মানে ?'

'মানে খুব সোজা। মহাকাশকে—ল্যাটিনের মত উচ্চারণ করে ম্যোহাকাশিয়াম বলা যেতে পারে সহজেই, আর ঠিক ঐ ভাবেই অতিথি হবে অ্যাটিঠেয়াম। ব্যস, এক ঢিলে দু পাখী মরবে। কেমন না ?'

বীতশোকবাবুর স্ত্রী সাদাসিধে মানুষ, তিনি বললেন, 'আমি বাবা, অত বড় নাম উচ্চারণ করতে পারব না। আমি ওকে ডাকব স্রেফ অতু বলে। যেমন সতীন লাহাকে বলি সতু লাহা, বীরেন চাটুজ্যেকে বলি বীরু চাটুজ্যে, সেই রকম অতিথি থেকে অতু।'

কিন্তু নামকরণ যা হয় একটা হলেও গোল বাধল এই ম্যোহা-কাশিয়াম অ্যাটিঠেয়াম ওরফে অতুকে খাওয়ানো নিয়ে। কিছুই সে খায় না। ঘাস, পাতা, গাছের ফল, ছোলা, মটর থেকে শুরু করে মাছ, মাংস, লুচি, হালুয়া—মায় ভীম নাগের সন্দেশ এনে তার সামনে ধরা হল কিন্তু কিছুই সে মুখে দেবে না। অথচ না খেলে কি কেউ বাঁচে ? হোক না সে অন্য গ্রহের জীব। বাঁচতে হলে তাকে কিছু না কিছু খেতেই হবে।

বিজ্ঞানীরা এসে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতায় যত রকম খাওয়াবার পদ্ধতি তাঁদের জানা ছিল সব রকম নিয়ে পরখ করা হল। এমন কি গ্লুকোজ ইনজেকশন দিয়ে টিকিয়ে রাখা যায় কিনা সে চেষ্টাও বাদ গেল না। কিন্তু ইনজেকশন দেবে কি করে ? পাথরের মত শক্ত ওর গা, ইনজেকশনের ছুঁচ ভেঙে গেল, কিন্তু ওর গায়ের চামড়া ফুটো করে তা ঢোকানো গেল না। শেষে সবাই হতাশ হয়ে পড়লেন।

অবশেষে একজনের মাথায় বুদ্ধি এল, তিনি বললেন, 'ওকে ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক না চরে খাবার জন্য। নিজের খাবার ও হয়তো নিজেই খুঁজে বার করে নেবে।'

শেষ পর্যন্ত তাই করা হল আর আশ্চর্য, তাইতেই সমস্যা মিটে গেল। দেখা গেল অতুকে বাগানে নিয়ে ছেড়ে দিতেই ট্যাঙ্কের মত

গড়াতে গড়াতে চলল খালের দিকে। খালের ধারে ছিল স্তূপাকার বালি আর রাস্তা বাঁধাবার পাথর। সেইখানেই গিয়ে থেমে গেল ও তারপর খুদে খুদে ধারাল দাঁত দিয়ে কুরে কুরে খেতে লাগল সেই পাথর। বালির দানাগুলোও মুখে নিয়ে চিবুতে লাগল পরম তৃপ্তির সঙ্গে।

তা হলে পাথর আর বালি খাইয়েই ওকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে।

কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য কাণ্ড দেখা গেল পরদিন। একদিনেই, মনে হল, অতু যেন অনেকটা মোটা হয়ে গেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সে অস্বাভাবিক রকম মোটা হয়ে পড়ল, দেহের আকারও বেড়ে চলল সমান তালে। মাস খানেকের মধ্যেই সেই ছোট্ট চড়াই পাখীর আকারের জন্তুটি একটা পূর্ণবয়স্ক মোটাসোটা বিড়ালের মত বড় হয়ে উঠল। বীতশোকবাবু রোজ তাকে পরীক্ষা করেন। পিঠে হাত বুলিয়ে দেখেন ওর গা আগের মতই শক্ত রয়েছে। শরীরে এত মাংস গজালেও তার সেই পাথুরে ভাব একটুও কমে নি। উপরন্তু, মনে হল ওর গায়ে যেন রোজই খানিকটা করে কি জমছে—কিন্তু সেও ঐ রকম দানা দানা এবং পাথরের মতই শক্ত। মনে হয় শরীরটা অসম্ভব বেড়ে ওঠার প্রধান কারণও হয়তো এই। না হলে স্বাভাবিক নিয়মে কোন জীব যে এত তাড়াতাড়ি এত বড় হয়ে যেতে পারে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বীতশোকবাবু এবার ওকে পোষ মানাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, সেই সঙ্গে শুরু হল ওকে দিয়ে নানা কসরৎ দেখানো। অতু কিন্তু কড়মড় করে পাথর চিবুনো ছাড়া আর কোন ব্যাপারে বিশেষ বাহাদুরী দেখাতে পারল না। তবে হ্যাঁ, একবার একটা লোহার ছুরি ওর মুখের কাছ ধরতে সেটাও ও মুহূর্তের মধ্যে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলেছিল, তবে খায় নি। ওর ঐ খুদে খুদে দাঁত যে লোহার চেয়েও অনেক শক্ত তারই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তাই থেকে। আর একবার বীতশোকবাবুর স্ত্রী কি কারণে ওর ওপর রেগে গিয়ে ওকে একটা লম্বা লাঠি দিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দেবেন ঠিক

করেছিলেন, কিন্তু এক ঘা দিতেই ওর তো কিছুই হল না, লাঠিই ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল। তিনি তখন আরও চটে গিয়ে একটা লোহার খুন্তি নিয়ে ওর পিঠে ঘষে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও ওর গায়ের চামড়া একটুও ছড়ে যায়নি, উল্টে লোহার খুন্তি কয়েক জায়গায় ভেঙে এবড়োখেবড়ো হয়ে গিয়েছিল, আর ওর পিঠে আঁচড় না পড়ে আঁচড় পড়েছিল খুন্তির গায়ে। শিরীস কাগজ দিয়ে লোহা ঘষলে যেমন আঁচড় পড়ে অনেকটা সেই রকম। দেখেশুনে তাজ্জব বনে গিয়েছিল সবাই।

কিন্তু এর চেয়েও তাজ্জব কাণ্ড ঘটেছিল আর একদিন।

সেদিন সারা দিন বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সঙ্গে বইছে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস। সবাই মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘরে বসে আছে। এরই মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল অতু নেই—হাওয়া! কোথায় গেল—কোথায় গেল—খোঁজ্—খোঁজ্—খোঁজ্। অনেক খোঁজাখুঁজি করে শেষে সন্ধান পাওয়া গেল রান্নাঘরে। দাউ দাউ করে উনুন জ্বলছে আর সেই উনুনের মধ্যেই বসে অতু দিব্যি আরামে আগুন পোহাচ্ছে। আগুনের গনগনে আঁচে তার গা পুড়ে যাওয়া দূরের কথা, একটু ছ্যাঁকাও লাগছে না। জন্তুটা কি তা হলে হঠযোগও জানে?

এইভাবে অতুকে নিয়ে সমস্যার পর সমস্যা দেখা দিতে লাগল কিন্তু কোন সুরাহা হল না। শেষে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে বিজ্ঞানীরা ওকে দেখতে আসতে শুরু করলেন, পৃথিবীর নামকরা সব চিড়িয়াখানার কর্তারা ওকে কিনে নেবার জন্য অজস্র টাকা দেবার প্রস্তাব করে পাঠালেন। কিন্তু বীতশোকবাবু রাজী হলেন না। অতু ক্রমাগত বহরে বেড়ে চলল। তার গায়ে সেই শক্ত পাথুরে দানা ক্রমাগত জমতে লাগল। রোদে দাঁড়ালে মনে হত ওর চকচকে গা থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে।

বেশ চলছিল, কিন্তু হঠাৎ যে ঐ রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটবে তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু তাই ঘটল শেষে।

ঘরের কয়েকটা জানলার সার্সি ভেঙে যাওয়ায় একজন মিস্ত্রী

এসেছিল কাচ লাগাতে। পুটিং দিয়ে কাচ বসাবার সময় অনেক সময়েই দেখা যায় যে কাচ একটু বড় হয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে কেটে একটু ছোট করে নিতে হয়। এজন্য মিস্ত্রীরা এক রকম কাচ-কাটা অস্ত্র বা ছুরি ব্যবহার করে। অস্ত্রটা আর কিছু না, একটা লম্বা হ্যাণ্ডেলের মাথায় ছোট্ট এক টুকরো হীরে বসানো। পৃথিবীর মধ্যে হীরে হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত জিনিস। তাই হীরে দিয়ে সব কিছু কাটা যায়,—কিন্তু হীরেকে কাটা, সম্ভব হলেও, অত সহজ নয়। কাচ কাটতে হলেও ঐ হীরে বসানো ছুরিই ব্যবহার করে মিস্ত্রীরা। বীতশোকবাবুর বাড়ীতেও এই মিস্ত্রীটি ঐ রকম একটা হীরে বসানো ছুরি নিয়ে এসেছিল। ছুরিটা পাশে রেখে মিস্ত্রী গজ কাঠি দিয়ে কাচ মাপছে এমন সময় গড়াতে গড়াতে অতু এসে হাজির, আর পাশেই এমন একটা নতুন জিনিস দেখে তার বোধ হয় শখ হল জিনিসটা চিবিয়ে দেখতে। সে অম্লান বদনে ছুরিটা মুখে তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে চাপ দিল আর সঙ্গে সঙ্গে খটাস—হ্যাণ্ডেলটা ভেঙে দু টুকরো।

অমন একটা দামী অস্ত্র এভাবে ভাঙতে দেখে মিস্ত্রী আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না, সেই ভাঙা টুকরোটা তুলে নিয়ে তার ঐ হীরের ফলা দিয়ে সজোরে অতুর পিঠে কয়েক বার আঁচড়ে দিল সে —ঠিক যেমন করে কাচ কাটে। আর সঙ্গে সঙ্গে অতু লাফিয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তার পাথরের মত শক্ত পিঠ থেকে ফিনকি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল রক্ত। লাল রক্ত নয়, ঈষৎ বাদামী রং-এর ঘন রসের মত একটা জিনিস; কিন্তু তা আর বন্ধ হল না। বার কয়েক লুটোপুটি খেয়ে দাপাদাপি করতে করতে হঠাৎ নিঃসাড় হয়ে গেল অতু, আর উঠল না। তার গা থেকে গড়িয়ে আসা চাপ চাপ রস জমাট কাচের মতই জমে রইল মেঝের ওপর।

বীতশোকবাবু খবর পেয়ে ছুটে এলেন, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে।

অতুর প্রাণহীন দেহটা নিয়ে আর কিছু করার ছিল না। বীতশোকবাবু সেটা পাঠিয়ে দিলেন বিজ্ঞানীদের কাছে—এবার যদি

মহাকাশের ঐ অদ্ভুত জীবের রহস্যের কিছুটা মীমাংসা করতে পারেন তাঁরা।

অতুর দেহ নিয়ে পোস্ট মর্টেম পরীক্ষা করা হল, রাসায়নিক পরীক্ষা করা হল এবং অবশেষে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে একটা রিপোর্ট তৈরী করলেন। সেই অদ্ভুত রিপোর্ট থেকে খানিকটা এখানে তুলে দিয়ে অতুর কাহিনী শেষ করছি।

'মহাকাশ থেকে খসে পড়া উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে যে অদ্ভুত প্রাণীটি পৃথিবীতে এসে হাজির হয়েছিল সেটিকে আমরা তার মৃত্যুর পর ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি। প্রথমেই আমাদের পরিচিত পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্যের কথা বলা দরকার।

"পৃথিবীর সমস্ত জীবদেহের—তা সে প্রাণীই হোক আর গাছ-পালাই হোক—প্রধান উপাদান হচ্ছে কার্বন বা অঙ্গার। এজন্য বিজ্ঞানীরা জৈব পদার্থ বলতে সেই সব পদার্থকেই বোঝেন যার মধ্যে কার্বন আছে। আর এইজন্যই জৈব রসায়ন বিজ্ঞানের আধুনিক নামই হচ্ছে কার্বন রসায়ন বা 'কেমিস্ট্রি অব দি কার্বন কম্পাউণ্ডস'।

"এখন, কথা হচ্ছে, পৃথিবীর বাইরে মহাকাশের অগণিত গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে এমন কোন জগৎ থাকা বিচিত্র নয় যেখানে এই কার্বন একেবারেই পাওয়া যায় না। যদি তাই হয়, তা হলে কি সেখানে কোন জীবিত প্রাণী থাকতে পারে?"

"আমাদের পরিচিত প্রাণিজগৎ নিয়ে বিচার করলে এর উত্তর হবে—এক কথায় 'না'। কিন্তু আমাদের পরিচিত প্রাণিজগৎ ছাড়া অন্য কোন প্রাণিজগতের কথা ভাবতে গেলে অতটা জোরের সঙ্গে 'না' বলা উচিত হবে কি? রসায়ন বিজ্ঞানে কার্বনের অনেকটা সমগোত্রীয় আর একটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গেও আমরা পরিচিত—তার নাম সিলিকন। এই সিলিকন পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে, এমন কি এক অক্সিজেন ছাড়া আর কোন মৌলিক পদার্থই অত বেশী পরিমাণে পাওয়া যাবে না। আমাদের পরিচিত বালি এই

সিলিকন আর অক্সিজেনের সংযোগে তৈরী—বিজ্ঞানের ভাষায় ওর নাম সিলিকন ডাইঅক্সাইড বা সিলিকা, এ ছাড়া নানা রকম পাথর আর মিনারেলের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে মিশে আছে সিলিকন। কোয়ার্টজ, ফ্লিনট ইত্যাদি নামে যে সব মিনারেল বা পাথর সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে সেগুলি প্রায় খাঁটি সিলিকা। এ ছাড়া অভ্র (মাইকা), কেয়োলিন, ট্যালক, চীনে মাটি এদেরও উপাদানে সিলিকা খুব বেশী।

"যাঁরা একটু আধটু রসায়ন বিজ্ঞান চর্চা করেছেন তাঁরাই জানেন পৃথিবীর জীবদেহে এত অধিক সংখ্যক কার্বনঘটিত পদার্থ ছড়িয়ে থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে কার্বনের একটি বিশেষ গুণ—কার্বনের পরমাণুগুলি একটার সঙ্গে একটা মিশে বিরাট শিকল গড়তে পারে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন সিলিকনেরও এই রকম পরমাণু এবং অণুর শিকল গড়ার গুণ রয়েছে অক্সিজেনকে নিয়ে। সুতরাং কার্বনের মত অজস্র সিলিকনঘটিত পদার্থ তৈরী হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়।

"আমাদের ধারণা যে উল্কাপিণ্ডটি বীতশোকবাবুর বাগানে পড়েছিল সেটি এসেছিল এমন কোন গ্রহ থেকে যেখানে কার্বন নেই, কিন্তু সিলিকন আছে প্রচুর। এবং সেখানে যে সব জীব বাস করে তাদের দেহ কার্বনের বদলে এই রকম সিলিকনঘটিত পদার্থ দিয়ে তৈরী। মহাকাশের রাজ্যে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে মঙ্গল গ্রহ আর বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে ছড়িয়ে আছে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রহের কণা—যাদের বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ। এই গ্রহাণুপুঞ্জের উপাদান সম্বন্ধে আমরা এখনও বিশেষ কিছু জানি না। এই উল্কাটি হয়তো ঐ রকম কোন গ্রহাণুপুঞ্জ থেকেই ছিটকে এসেছিল।

"কার্বন দিয়ে তৈরী জৈব পদার্থগুলির মধ্যে শক্ত, তরল এবং গ্যাস সব রকম পদার্থই আছে। প্রাণিদেহের মধ্যে হাড় ছাড়া সবই ঐ রকম নরম পদার্থ দিয়ে তৈরী। কিন্তু সিলিকন দিয়ে তৈরী প্রায় সমস্ত পদার্থই শক্ত—পাথরের মত শক্ত। সুতরাং আমরা যদি সিলিকন

দিয়ে তৈরী কোন জৈব পদার্থের সন্ধান পাই তাহলে তার দেহ নিশ্চয়ই পাথরের মত শক্ত হবে। উল্কাপিণ্ডের মধ্যে পাওয়া অদ্ভুত প্রাণী অতুর দেহ তাই ঐ রকম পাথরের মত শক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

"নিঃশ্বাস নেবার সময় পৃথিবীর জীবেরা বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নেয়, আর ছেড়ে দেয় কার্বনডাই-অক্সাইড। কার্বন আর অক্সিজেন মিশে যা তৈরী হয় এই কার্বনডাই-অক্সাইড হচ্ছে গ্যাস, তাই ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তা বাতাসে মিশে যায়। কিন্তু সিলিকন যখন অক্সিজেনের সঙ্গে মিশবে—যা অতুর নিঃশ্বাস নেবার সময় ঘটছিল, তখন সেই অক্সিজেন আর সিলিকন মিলে তৈরী হবে সিলিকন ডাই-অক্সাইড, যা হচ্ছে বালি, অর্থাৎ যা মোটেই গ্যাস নয়। এই শক্ত বালি বা সিলিকা প্রতিনিয়তই নিঃশ্বাসের সঙ্গে তৈরী হচ্ছিল ওর শরীরে আর শক্ত বলে তা বেরিয়ে যেতে পারছিল না—ক্রমাগত জমা হচ্ছিল ওরই দেহের ওপর। তাই ওকে অত তাড়াতাড়ি মোটা হতে দেখা যাচ্ছিল আর আকারেও ও অত তাড়াতাড়ি বাড়ছিল। মনে হয় এ বাড়ার আর শেষ হত না—যদি না ওভাবে ওর মৃত্যু হত। তখন সেও হত একটা নতুন সমস্যা।

"আমরা যে সব খাদ্য খাই,—আমিষই হোক আর নিরামিষই হোক,—তার মধ্যে প্রচুর কার্বন থাকে, আর থাকে নাইট্রোজেন। অতুর খাবারে কার্বনের প্রয়োজন ছিল না—প্রয়োজন ছিল সিলিকনের। কাজেই বালির দানা আর পাথরের কুচি খেয়েই সে তা সংগ্রহ করে নিত, সেগুলো খাবার মত ধারাল দাঁতও তার ছিল। নাইট্রোজেনও হয়তো তার দরকার হত। সেটা সে কোথায় পেত——আমিষ বা নিরামিষ কোনটাই যদি সে না খায়? ওর পায়ের তলায় গোল গোল গুটি দেখে সে রহস্যেরও খানিকটা মীমাংসা আমরা করেছি। আমাদের আশপাশের বাতাসে ছড়িয়ে আছে প্রচুর নাইট্রোজেন, কিন্তু বেশীর ভাগ গাছপালাই সেখান থেকে নাইট্রোজেন নিতে পারে না—নেয় মাটি থেকে। কেবল মাত্র কতকগুলি শুঁটি জাতীয় গাছ যাদের বলা হয় লেগুমিনাস প্ল্যান্টস,

—বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নিতে পারে। ওদের শিকড়ে এক রকম জীবাণু এসে গুটি বাঁধে তারাই ওদেরকে এই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে দেয়। অতুর পায়ের নীচেও ঐ রকম গুটি দেখে ঐ রকম একটা কিছুই ঘটত বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

"জ্বলন্ত উল্কার প্রচণ্ড উত্তাপেও অতু মরেনি কেন আর উনুনের মধ্যে বসেও ও এত আরাম পেল কেন—এ প্রশ্নেরও জবাব দেওয়া খুব কঠিন নয়। সিলিকনঘটিত পদার্থগুলি খুব বেশী উত্তাপ সহ্য করতে পারে। দেড় হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপেও ওদের কিছুই হয় না —কোন কোনটা ২০০০—২২০০ ডিগ্রী উত্তাপও সইতে পারে। কাজেই ঐ সিলিকনঘটিত পদার্থে তৈরী দেহের জন্য অতুর আগুনকে ভয় করার বিশেষ কারণ ছিল না। হয়তো ঐ কারণেই উল্কাপিণ্ড আকাশে জ্বলে উঠবার সময়েও তার কোন ক্ষতি হয় নি। কিংবা হয় তো ওর জন্মই হয়েছে ঐ উল্কাপিণ্ডের পতনের পর। হয়তো ডিমের মত কোন খোলে ও বন্ধ ছিল, আগুনের আঁচে সে ডিম ফুটে গেছে— যেমন ফোটে ইনকিউবেটর যন্ত্রের আঁচে হাঁসের ছানা, আর আমরা ওকে জন্মের পরেই দেখতে পেয়েছি।

"অবশেষে এর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধেও আমাদের যা ধারণা তা ব্যক্ত করছি। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্ত পদার্থ হচ্ছে হীরে, তার পরেই স্থান হচ্ছে কোরাণ্ডামের—যা নাকি সিলিকন আর অক্সিজেন দিয়ে তৈরী। কোন শক্ত জিনিস তার চাইতে নরম জিনিসের ওপর আঁচড় কাটতে পারে, তাকে ভেঙেও দিতে পারে। এই জন্যই বীতশোক-বাবুর স্ত্রীর লাঠি অতুর গায়ে লেগে ভেঙে গিয়েছিল, ভেঙে গিয়েছিল লোহার খুন্তিও। শুধু ভাঙেই নি, তার ওপর আঁচড়ও পড়েছিল ওর গায়ের ঘষা লেগে। ওর গাটাও তো কোরাণ্ডামের মতই শক্ত ছিল কিনা! লোহার ছুরি দাঁতে গুঁড়ো করে দেওয়াও এই কারণেই ওর পক্ষে খুবই সহজ ছিল। আবার ঠিক ঐ কারণেই, যখন ওর শরীরের চেয়েও শক্ত হীরে বসানো ছুরি দিয়ে ওর পিঠে আঁচড়ে দেওয়া হল তখন হীরের চেয়ে নরম বলে ওর পিঠ আর সে আঘাত সহ্য করতে

পারলো না। সেই আঁচড়ে ক্ষত হয়ে ওর গা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। সে রক্ত লাল না হয়ে ঈষৎ বাদামী হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং তা জমে গেলে কাচের মত শক্ত হয়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়—কারণ সে রক্তের উপাদানেও নিশ্চয়ই সিলিকন অনেক-খানি জায়গা জুড়ে ছিল—যেমন থাকে কাচে। তা ছাড়া আমাদের পৃথিবীর প্রাণিদেহে রক্তক্ষরণ শুরু হলে তা আপনি বন্ধ হয়ে যাবার যে ব্যবস্থা আছে—অতু জাতীয় প্রাণীর রক্তে সম্ভবতঃ সে ব্যবস্থা ছিল না। কারণ ঐরকম শক্ত দেহ থেকে রক্তক্ষরণ কদাচিৎ ঘটতে পারে। কাজেই, ওর রক্তক্ষরণ শুরু হলে আর তা বন্ধ হওয়া সম্ভব হয়নি। আর তাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত ওর কাল।”

মহাপ্লাবন

সেই ভয়ানক দিনটার কথা মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তারিখটা ছিল ৩১শে ডিসেম্বর। রাত বারোটা প্রায় বাজে। নতুন বছরকে স্বাগত জানাবার প্রস্তুতি চলছে। এক্ষুণি বেজে উঠবে বিগ্‌ল্‌, সঙ্গে সঙ্গে আরও নানারকম বাজনা। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাবে পর পর কয়েকটা তোপের আওয়াজ। কারণ সেদিনটা তো শুধু একটা বছরেরই শেষ দিন নয়, একটা শতাব্দীর শেষ দিন। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিন। একটু পরেই শুরু হবে ২০০০ সাল।

না, আমি সেদিন কলকাতা শহরে বসে ছিলাম না। প্রায় দেড় কোটি বাসিন্দার এই লোক গিজগিজ শহরে প্রাণ হাঁসফাঁস করছিল। অবশ্য গত পনেরো বিশ বছরে কলকাতায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রিকশ টিকশ কবে উঠে গেছে, মাটির তলা দিয়ে চলছে টিউব রেলের গাড়ি, দোতলা তেতলা রাস্তাও হয়েছে অনেকগুলি। মাথার ওপর হেলিকপ্টার সব সময়েই উড়তে দেখা যায়,—মোটর গাড়ির চেয়ে এটাই এখন বেশি জনপ্রিয়। একটু অবস্থাপন্ন অনেকেই ছোট ছোট হেলিকপ্টার প্রাইভেট মোটর গাড়ির বদলে কিনতে শুরু করেছেন। নিজেরাই চালান। গ্যারেজ লাগে না, রাত্তিরে ছাদের ওপরে রেখে দেওয়া যায়, আর পেট্রোলও তো বেশ সস্তা। তার জন্য আর বিদেশের প্রত্যাশায় হাঁ করে চেয়ে থাকতে হয় না। কলকাতার প্রায় গা ঘেঁষা সুন্দরবনেই প্রচুর পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাচ্ছে। দেশের পেট্রোলের চাহিদা এখন দেশ থেকেই দিব্যি মিটিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু—

হ্যাঁ, সেই 'কিন্তু'টা কিন্তু তেমনি রয়ে গেছে। একদিক দিয়ে যেমন

'আরাম' বাড়ছে, অন্য দিকে তেমনি বাড়ছে 'হারাম'। গত পনেরো বছরে শহরের জনসংখ্যা তিনগুণ বেড়ে গেছে। রাস্তায় হাঁটতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে ভিড়ের ঠেলায়। বারো মাসই যেন রথের বা চড়কের মেলা! বাপরে বাপ!

তাই পালিয়ে এসেছিলাম একেবারে পৃথিবীর ওপিঠে পসিডনেরিওর নিরিবিলি আশ্রয়ে।

চিনতে পারলে না তো জায়গাটা? আচ্ছা, দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাপটা খুলে বস। নামতে নামতে নামতে নামতে আর্জেন্টিনা পেরিয়ে, পাটাগোনিয়ারও দক্ষিণ প্রান্ত প্রায় ছুঁয়ে দেখবে একটা জলপ্রণালী রয়েছে ভূগোলে যার নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাগেলন প্রণালী। সেই ম্যাগেলন, যিনি জাহাজে পৃথিবীকে একটা পাক খেয়ে প্রথম প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে পৃথিবী গোল। সেই প্রণালী পার হয়ে আরও নীচের দিকে নেমে এলে পাওয়া যাবে কেপ হর্ন। তারপর একটুখানি সমুদ্র পেরিয়ে ডিয়েগো রামিরিয়া দ্বীপপুঞ্জে এই পসিডনেরিও শহর।

এত জায়গা থাকতে এখানে কেন এলাম? সেই কথাই তো বলতে চাইছি। এসেছিলাম আমার বন্ধু সহ্যাদ্রির পাল্লায় পড়ে।

সহ্যাদ্রি! না না, পশ্চিম ভারতের সহ্যাদ্রি পাহাড়ের সঙ্গে নামের একটু মিল থাকলেও সহ্যাদ্রি খাঁটি বাঙালীর ছেলে। ওর পুরো নাম সহ্যাদ্রি ভট্টশালী। কিন্তু কাগজে কলমে থাকলেও নামের শেষে পদবীটা বড় কেউ একটা আজকাল ব্যবহার করে না তো, কাজেই শুধু সহ্যাদ্রিই যথেষ্ট।

তবে সহ্যাদ্রি নামকরণেরও একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে।

ওদের বংশের সকলেই খুব বিদ্বান। বাবা, ঠাকুরদা দুজনেই পরম পণ্ডিত। কিন্তু দুজনেরই স্বভাবে ছিল দারুণ একটা অস্থিরতা। একটুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে পারতেন না কেউ। ব্যাপার দেখে ওর ঠাকুমা নাতির নাম রাখলেন সহ্যাদ্রি,—অদ্রি অর্থাৎ পাহাড়ের মত সহ্য করবার ক্ষমতা যার। হয়তো ভেবেছিলেন ঐ নামকরণের

জোরেই নাতিটি তাঁর কিছু সহ্যগুণ আয়ত্ত করবে। কিন্তু ফুঃ, কোথায় কি! সেই শৈশব থেকে বাপ ঠাকুরদার মতই অস্থিরচিত্ত হয়ে উঠেছে সে।

যাক, এসব অনেকদিন আগেকার কথা। ঠাকুরদা, ঠাকুমা, বাবা —এঁরা কেউই এখন নেই। সহ্যাদ্রিও আর কচি খোকাটি নেই। তবে বাপ ঠাকুরদার কাছ থেকে সে শুধু অস্থিরতাটুকুই পায় নি, তাঁদের পাণ্ডিত্যেরও কিছুটা পেয়েছে। আবহাওয়া বিজ্ঞান-বিশারদ হিসেবে তার নাম এখন দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে পৃথিবীর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, আর তারই ফলে তার ডাক পড়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার নীচে এই একদা অখ্যাত কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের নামকরা প্রগতিশীল শহর পসিডনেরিওতে। এখানকার মেটিওরিলজিক্যাল অর্থাৎ আবহবিজ্ঞান বিভাগের সেই এখন বড়কর্তা।

আমার দেশভ্রমণের বাতিক বহুদিনের। ভারতবর্ষ তো যাকে বলে গুলে খাওয়া, তাই খেয়েছি আমি। ইওরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এমন কি অস্ট্রেলিয়াও ঘোরা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ক্যানাডা তো রাম-শ্যাম-যদু-মধুও যাচ্ছে, আমার না যাবার কারণই নেই। বাকি শুধু এই দক্ষিণ আমেরিকা বা তার আশপাশের কয়েকটা দ্বীপ।

এখানে আমার একটু পরিচয় দিয়ে দিলে বোধ হয় ভালো হয়। সহ্যাদ্রি আমার সহপাঠী বন্ধু—সেই ইস্কুল থেকে। ওর মত পণ্ডিত না হলেও লেখাপড়ায় আমিও নেহাৎ কাঁচা ছিলাম না। ফলে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে নামের পাশে, পি. এইচ. ডি. ডি এস. সি. ইত্যাদি আরও গোটা কতক ডিগ্রী বসিয়ে নিতে তেমন কষ্ট হয় নি। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের অধ্যাপক পদে জাঁকিয়ে বসেছি। আর, সবাই জানে, এ কাজে ছুটিছাটা খুব বেশি। তার ওপর শিক্ষা অভিযানের নাম করে আরও কিছু ছুটি বাগিয়ে নেওয়াও তেমন কঠিন নয় আমার কাছে।

আমার যা চাকরি তাতে এভাবে পৃথিবী চষে বেড়ানোর মত

আর্থিক সঙ্গতি আমার থাকার কথা নয়। কিন্তু সে বাধা কাটাবার সুযোগও জুটেছে বারে বারে। ভালো ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আমার কিছু নাম ডাক আছে। তা ছাড়া ইংরেজী বাদেও আরও কয়েকটা ভাষা আমি বেশ বলতে পারি। নানা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাই বক্তৃতা দেবার জন্য আমার ডাক পড়ে। (সত্যি কথা বলতে, আমিই নানা সূত্রে সেই আহ্বানের ব্যবস্থা করিয়ে নিই।) যাই হোক, ডাক সত্যিই পড়ে এবং আমিও এক পায়ে খাড়া। এমনি করেই পসিডনেরিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও একটা ডাক এল—সহ্যাদ্রিরই চেষ্টায়, তা বলা বাহুল্য। ব্যস, আর কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলাম, আর ওদেরই পয়সায় একদিন উড়ে এলাম এই অজানা শহরে। সহ্যাদ্রি এয়ারপোর্টে এসে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

কাজ যথা সময়ে চুকে গেল কিন্তু সহ্যাদ্রি সহজে ছাড়ল না। বলল, 'থেকে যা দিন কতক। কি করবি দেশে গিয়ে সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় ঘেঁটে ঘেঁটে?' সহ্যাদ্রি-গৃহিণী বললেন, 'হ্যাঁ, তাই থেকে যান দমবাবু! তবু একটু বাংলা কথা বলে তৃপ্তি পাই। এ পোড়ার দেশে বাংলায় কথা বলার লোক কই, এক আপনার বন্ধু ছাড়া?'

আমার নাম দমবাবু মোটেই নয়—অরিন্দম, কিন্তু বন্ধুরা ছেলেবেলা থেকেই আমাকে দম বলে ডাকে। বলে, নামের আগে একটা শত্তুর রেখে কি হবে? সহ্যাদ্রি-গিন্নী সুরসিকা, তিনিও স্বামীর দেখাদেখি প্রথম থেকেই আমাকে দমবাবু বলতে শুরু করেছিলেন।

অগত্যা রয়ে গেলাম। তা ছাড়া আর একটা মতলবও ছিল। পসিডনেরিও থেকে ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ খুব একটা দূরে নয়। ১৭।১৮ বছর আগে এই ফকল্যাণ্ড নিয়ে ইংরেজ আর আর্জেন্টিনিওদের মধ্যে বেশ এক হাত লড়াই হয়ে গিয়েছিল এবং সে জল গড়িয়েছিল অনেক দূর। সেই ফকল্যাণ্ডের এত কাছে এসে একবার দেখে যাব না কি মধু আছে এখানে যার জন্য অত কাণ্ড?

সহ্যাদ্রিকে বললাম। সেও এক পায়ে খাড়া। বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ,

আমারও দেখা হয় নি জায়গাটা। ওখানে নাকি ইদানীং মাঝে মাঝে কারণে অকারণে আচমকা একটা হাওয়া ছাড়ছে যা অনেকটা সাইক্লোনের মত। কেন হচ্ছে সে খবরটা ভালো করে জানতে হবে। তবে তার আগে ভাবছিলাম, তুইও এসে গেছিস, একবার অ্যাণ্টার্কটিকার ধারপাশটা ঘুরে এলে কেমন হয়?'

'বাঃ, ভালো বলেছিস। এখন ওখানেও গ্রীষ্মকাল। ওখানকার টেম্পারেচার বড়জোর মাইনাস দশ কি বারো ডিগ্রী হবে। খুব একটা অসহ্য শীত নয়। অন্ততঃ উপকূল পেরিয়েও খানিকটা ভেতরে চলে যাওয়া যেতে পারে।'

আমার কথা শুনেই হঠাৎ সহ্যাদ্রি লাফিয়ে উঠল। তারপর?

তারপর ওর যা স্বভাব, অমনি ঘরময় পায়চারি শুরু করে দিল। কিছু একটা মাথায় এলে যতক্ষণ না তা হাসিল হচ্ছে তাই নিয়ে ও অধৈর্য হয়ে পড়ে। ওর পায়চারিও বন্ধ হয় না।

ঠিক হল কয়েক দিন পরেই নববর্ষ আসছে; শুধু নববর্ষ নয়,—নব শতাব্দী ঐ দিনই গিয়ে নামতে হবে অ্যাণ্টার্কটিকা—কিনা কুমেরুর চিরতুষার ময়দানে। তাঁবু ফেলে চালাতে হবে সমীক্ষা। আমার সমীক্ষা হবে ভৌগোলিক, ওর হবে আবহাওয়ার ওপর, একই সঙ্গে চলবে দুটো।

শুনেছি এই চিরতুষারের রাজ্যে নাকি জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট হ্রদের মত আছে—ঠিক মরুভূমিতে মরুদ্যানের মত। যদি খুঁজে পাই, ও নিয়ে জোর পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এবারে ওপর ওপর দেখে নিয়ে পরে আরও তৈরি হয়ে আসব। সহ্যাদ্রি বলল, এখানকার বাতাসটা সে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখবে। এই বাতাসে নাকি কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। কতটা বাড়ছে জানা দরকার।

জনা চার পাঁচ সাহসী এবং অভিজ্ঞ সঙ্গী সহ্যাদ্রিই জুটিয়ে নেবে। কয়েকটা বড়সড় শীততাপনিয়ন্ত্রিত হেলিকপটার ওদের আবহাওয়া অফিসেই আছে, তা থেকে বড়সড় শক্ত পোক্ত দেখে একটা বেছে

নিলেই হবে। হেলিকপটার হলে জাহাজের মত বরফ ভেঙে চলতে হবে না, ওপর থেকে দেখে, সুবিধে মত জায়গা বেছে নিয়ে ধীরে ধীরে হেলিকপটার নামিয়ে নিলেই হবে।

জোর প্রস্তুতি শুরু হল। সহ্যাদ্রিকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, তার ধৈর্য প্রায় ভাঙো ভাঙো।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯। কাল ভোরেই হবে আমাদের যাত্রা শুরু। হেলিকপটারটিকে সাজিয়ে গুজিয়ে তৈরি রাখা হয়েছে বাড়ির প্রশস্ত ছাদে। সঙ্গীরা শেষ রাত্রেই এখানে এসে জড় হবেন। তার পরই শুরু হবে আমাদের যাত্রা।

রাতে আর ঘুম আসতে চায় না। সহ্যাদ্রির ড্রইংরুমে বসে বসে সময়ের প্রতীক্ষা করছি। সামনে টেলিভিশনে নানা দেশের শতাব্দী সমাপ্তির প্রস্তুতি দেখানো হচ্ছে। গৃহকর্ত্রী, সহ্যাদ্রির স্ত্রী মিসেস ভট্টশালী বা মিসেস সহ্যাদ্রি ট্রে-তে করে তিন পেয়ালা কফি এনে সামনের টেবিলে রাখলেন। আমাদের দিকে টিপয়টা একটু এগিয়ে দিয়ে নিজেও এক পেয়ালা কফি নিয়ে বসে পড়লেন চেয়ারে। মুখে মিষ্টি হাসি। সহ্যাদ্রি যখন গোমড়া মুখে অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে তখন উনি ঐ হাসি দিয়েই ওকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। সহ্যাদ্রির বাড়িটা ঠিক সমুদ্রের গা ঘেঁষে। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্র দেখা যায়। আজ চাঁদের আলোয় তা ঝলমল করছিল। এই ঝলমলানির সঙ্গে ঐ হাসিটারও যেন বেশ মিল আছে।

কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজে সে হাসি থমকে গেল। খুব দূরে বজ্রপাত হলে যেমন হয় সেই রকম একটা অস্পষ্ট গুরুগম্ভীর আওয়াজ! পরমুহূর্তেই পায়ের তলায় মেঝেটা কেমন দুলে উঠল। আমি কফির পেয়ালাটা তুলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। খট খট করে ঘরের আসবাবপত্রগুলো সব নড়ে উঠল।

একটু পরেই সোরগোল শোনা গেল চারদিকে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বাইরে তখন প্রবল বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

সমুদ্রও সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেছে গর্জন। সহ্যাদ্রির স্ত্রীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে ছুটে চলে এলাম ব্যালকনিতে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে বাঁধ, তার পাশে কুচকুচে কালো মসৃণ বাঁধানো রাস্তা। সারি সারি আলোর থাম, তার তীব্র আলোয় চারদিক চকচক করছে। সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ছে বাঁধের গায়ে, তারপর সাদা ফেনা নিয়ে বাঁধ ডিঙিয়ে কালো রাস্তা ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এতদিন এখানে আছি, সমুদ্রের এ মূর্তি আর দেখিনি।

কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়ানো গেল না। ভূমিকম্প একবার থামছে, আবার দুলে উঠছে সমস্ত বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা। হঠাৎ ফস করে সব আলো নিবে গেল।

'কী দেখছেন? চলে আসুন, চলে আসুন। দরজা বন্ধ করুন। আপনার বন্ধুকে সামলান।' মিসেস সহ্যাদ্রির প্রচণ্ড হাঁকডাকে ফিরতে হল।

এরকম সময়ে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ানোই নিয়ম। কিন্তু নীচে নামার উপায় নেই। লিফট কখন বিকল হয়ে গেছে। সিঁড়ি একটা আছে বটে, কিন্তু কখনও ব্যবহার করা হয় না। তা ছাড়া লিফট বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোও সব নিবে গেছে। এখন নীচে নামা অসম্ভব। যেমন টলতে টলতে বেরিয়েছিলাম তেমনি টলতে টলতেই দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

রাত্রি বারোটা বাজে। এখনই গীর্জায় গীর্জায় টুংটুং বাজনা শুরু হবার কথা। বিগ্‌ল্ বাজবে, তোপ পড়বে, আরও কত কি! শুধু তো বর্ষ বিদায় নয়, এ যে শতাব্দীর বিদায়। কিন্তু কোথায় কি! মুহূর্তে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এমনি অবস্থা চলতে লাগল সারারাত।

ভোরবেলাই আমাদের হেলিকপটার রওনা হবার কথা ছিল, সে সব চুলোয় গেল। যাঁরা এই যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হবেন তাঁরা

শেষ রাত্রে এসে একত্র হবেন এই রকম ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলেন না।

এই ভাবেই, অস্বাভাবিক এক অবস্থার মধ্যে রাত্রি প্রভাত হল। তারপর এক সময়ে নতুন শতাব্দীর সূর্য দেখা দিল আকাশে।

ঝড় থেমেছে, কিন্তু তার তাণ্ডব লীলা শহরের বুকে বেশ কিছু ছাপ রেখে গেছে। একটু বেলা হলে সহ্যাদ্রিকে নিয়ে তাই দেখতে বেরুলাম।

কাছাকাছি সমুদ্রের ভিতর খানিকটা ঘুরে বেড়িয়ে আসার জন্য এখানে একটা ছোট জাহাজঘাটা ছিল। জাহাজ নয়, উঁচু লঞ্চ যাতায়াত করত ওখান থেকে। জাহাজঘাটার কাছে গিয়ে দেখি দুটো লঞ্চ কাত হয়ে পড়ে আছে, বেশ জখমও হয়েছে। জেটিরও খানিকটা ভেঙে গেছে। রাস্তায় গাছও পড়েছে অনেক। লা ভেলোদা পার্ক এখানকার বিখ্যাত পার্ক। সেখানে একটা বহু প্রাচীন ওক গাছ ছিল—ইয়োরোপ থেকে এনে লাগানো। সেটাও উপড়ে ফেলে দিয়েছে ঝড়।

ঘণ্টা দুয়েক ঘুরেই ফিরে এলাম, নইলে সহ্যাদ্রি গিন্নী দুশ্চিন্তায় পড়বেন।

দুপুরটা একরকম কেটে গেল। কিন্তু বেলা একটু গড়াতেই আবার শুরু হল একটা অস্বাভাবিক শব্দ। ঠিক যেন উঁচু জলপ্রপাত থেকে ভীষণ তোড়ে জল নেমে আসছে। আবার কি হল!

দেখতে দেখতে জলস্রোতের শব্দ ক্রমাগতই বেড়ে চলল। যেন একসঙ্গে দশটা বারোটা—না, আরও অনেক বেশি জলপ্রপাত নেমে আসছে তুমুল শব্দ করতে করতে শহরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সেই ভীষণ গর্জন ছাপিয়েও ভেসে আসছে ভয়ার্ত জনকোলাহল।

ছুটে ব্যালকনিতে গিয়ে দেখি সমুদ্রে সত্যিই বান ডেকেছে। উত্তাল বান। প্রচণ্ড জলস্রোত কলকল করে ঢুকে পড়ছে শহরে। বাঁধ যে কোথায় তলিয়ে গেছে কে জানে!

দেখতে দেখতে রাস্তাঘাটও জলের নীচে তলিয়ে গেল। জল

তখনও বাড়ছে। একতলার জানালা দরজা ছাপিয়ে উঠেছে। আরো—আরো—আরো। একি, জল যে শেষে একতলা ছাপিয়ে দোতলা পর্যন্ত উঠে এল! সমস্ত শহরটাই এবার জলের নীচে ডুবে যাবে নাকি?

হঠাৎ হাতে কে সজোরে আকর্ষণ করল। ফিরে দেখি সহ্যাদ্রি। স্বভাবসিদ্ধ অস্থিরভাবে বলল, 'কি দেখছিস হাঁ করে? খুঁজে খুঁজে হয়রান! শীগগির ছাদে চল। বাড়ির সবাই ছাদে উঠে গেছে। এক্ষুনি পালাতে হবে।'

অগ্রপশ্চাৎ ভাববার সময় পেলাম না, কেমন সম্মোহিতের মতই ছাদে চলে এলাম। হেলিকপটার তো কাল রাত থেকেই সাজানো ছিল, আর সময় নষ্ট না করে সবাই উঠে পড়লাম তাতে। দেখলাম, সহ্যাদ্রির স্ত্রী এরই মধ্যে টুকটাক কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস বাঁধা-ছাঁদা করে নিয়ে এসেছেন। ধন্যি গৃহিণী বলতে হবে!

হেলিকপটার একবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শূন্যে উঠে এল তারপর উড়ে চলল তীব্র বেগে—সোজা উত্তর দিকে।

কিন্তু এ কি, পায়ের তলায় কোথাও তো ডাঙা দেখা যাচ্ছে না! যেদিকে তাকাই কেবল জল—জল আর জল! ভালো করে দেখবার জন্য হেলিকপটারটা যতটা সম্ভব নীচে নামিয়ে আনা হল। না, দিক ভুল হয়নি। হেলিকপটারের দিকদর্শন যন্ত্রে দেখা গেল আমরা চলেছি সোজা উত্তর দিকেই। এদিকটায় আর তো সমুদ্র থাকবার কথা নয়, তার বদলে থাকবার কথা পাটাগোনিয়ার বিশাল অরণ্য। এতক্ষণে তো তাও ডিঙিয়ে আসার কথা। কিন্তু না, বনজঙ্গল তো দূরের কথা, কোথাও কোন মাটিরও চিহ্ন নেই। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সমুদ্র—কানায় কানায় ভরা সমুদ্র! আমরা যেন বাইবেলের সেই নোয়ার আর্কে চড়ে জলের ওপর ভাসছি। তফাৎ শুধু এই,—আমাদের আর্কটা ঠিক জলের ওপর নেই, রয়েছে ঠিক তার ওপরকার আকাশে।

তবে কি আবার এল সেই মহাপ্লাবন? আমাদের পুরানেও তো

একি, পায়ের তলায় কোথাও তো ডাঙা দেখা যাচ্ছে না!

আছে পৃথিবী পাপে ভরে গেলে ভগবান সমস্ত পৃথিবী মহাপ্লাবনে ভাসিয়ে দেবেন—যেমন একবার দিয়েছিলেন সৃষ্টির আদিতে। সেবারে শেষ রক্ষা করেছিলেন ব্রহ্মা। বিরাট একটা শিংওয়ালা মাছের রূপ ধরে সেই শিংএর সঙ্গে দড়ি বেঁধে একটা নৌকোয় তুলে নিয়েছিলেন মনু সমেত কয়েকজন পুণ্যবানকে, মহাপ্লাবনে নোয়ার মতই তাদেরকেও ডুবতে দেন নি। তাঁরাই শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছেন সৃষ্টি, কিন্তু আমাদের কে বাঁচাবে? আমরা তো নোয়া বা মনুর মত অত পুণ্যাত্মা নই!

সহ্যাদ্রি আবার অস্থির হয়ে পড়েছে। পেট্রোল যা আছে তা তো আর চিরস্থায়ী নয়! এখনও যদি ডাঙা না পাওয়া যায় তা হলে কি হেলিকপটার নিয়ে এই সমুদ্রেই শেষ শয্যা পাততে হবে আমাদের? তার স্ত্রী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন—যদি তাই হয় তা হলেই বা উপায় কি? পৃথিবী শুদ্ধু লোকের অদৃষ্টের সঙ্গে আমাদের অদৃষ্টও যে একই সূত্রে বাঁধা।

এইভাবে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে রাত ভোর হল। সূর্য উঠেছে কিন্তু ডাঙা ওঠে নি। পেট্রোল যা আছে তাতে হয়তো বড় জোর আর ঘণ্টা খানেক যাওয়া যাবে। তার পর?

ঘড়ির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। আধ ঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেল। নীচে সেই একই দৃশ্য—জল আর জল।

আরও পাঁচ মিনিট। সহ্যাদ্রি আরও অস্থির হয়ে উঠেছে। হঠাৎ তার স্ত্রী আমার দিকে এগিয়ে এলেন। মনে হল তাঁর চোখে মুখে একটা আশার আলো ফুটে উঠেছে। আমাকে ঠেলা দিয়ে বললেন, 'দেখুন দেখুন, ওটা কি বলুন তো? সী-গল মনে হচ্ছে না?'

হ্যাঁ, ঠিক তাই। মাথার ওপর, মনে হচ্ছে একটা পাখি,—সী-গলই হবে হয়তো, উড়ে যাচ্ছে। তার পাশে আর একটা, তাদের পেছনে আরও কয়েকটা।

তাহলে কাছাকাছি ডাঙা আছে নিশ্চয়ই। নইলে, সী-গলই হোক বা অন্য পাখিই হোক, ওরা আসবে কোথা থেকে? হাজার

হাজার কিলোমিটার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিশ্চয়ই নয় !

একটু পরেই মনে হল জল যেন কমে এসেছে, জলের ভিতর দিয়ে দু একটা গাছের মাথাও মনে হল উঁকি মারছে। সমুদ্রের ঢেউও যেন শান্ত হয়ে এসেছে। ভাবটা—অনেকটা তো এগিয়েছি, এবার থাক।

সত্যি সত্যিই অবশেষে ফুরিয়ে এল জল, সামনে দেখা গেল ডাঙা। পেট্রোল প্রায় নিঃশেষ। তবুও আর একটু চালিয়ে নিয়ে একটা সুবিধেমত সমতল ঘাস জমির ওপর নামানো হল হেলিকপটার। আমরা অক্ষত দেহেই নেমে এলাম মাটিতে।

কিন্তু এ কোথায় এসেছি আমরা ? হেলিকপটারের দূরত্ব নির্দেশক কাঁটা পরীক্ষা করে দেখা গেল প্রায় দু হাজার কিলোমিটার চলে এসেছি আমরা পসিডনেরিও থেকে। সামনে একটা নদী দেখা যাচ্ছে না ? হ্যাঁ, নদীই বটে, কিন্তু অসম্ভব উঁচু এর পাড়। পাড় থেকে নদী এত নীচুতে যে ওর দিকে তাকাতে ভয় করে। একেই তো বলে ক্যানিয়ন। তবে কি আমরা কোলোরাডোর ধারে এসে পড়লাম ? ওর ক্যানিয়ন বিখ্যাত, আর পসিডনেরিও থেকে প্রায় ২০০০ কিলোমিটারই হবে ওর দূরত্ব।

না, আর নদীর দিকে নয়, আর জল চাই না। চাই মাটি। মনে মনে আওড়াতে লাগলাম, 'হে মাটি, হে স্নেহময়ী, ঐ মৌন মূক ! ঐ স্থির, ঐ ধ্রুব, ঐ পুরাতন, সর্ব-উপদ্রব-সহা আনন্দভবন—শ্যামলা কোমলা…।'

কত দিনের কথা ? তা দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল। ঐতিহাসিক যুগে এ রকম কাণ্ড আর কখনও ঘটে নি। কুমেরু থেকে শুরু করে ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকার মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং অস্ট্রেলিয়ার বেশ খানিকটা অংশ, আর এর ভিতরকার বিস্তৃত অঞ্চলে যত দ্বীপটিপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সব এখন জলের তলায় তলিয়ে গেছে। আগে যেখানে ছিল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর এখন তারই আকার বহু পরিমাণ বেড়ে গিয়ে জন্ম নিয়েছে এক নতুন মহাসাগর, আমরা আর তাকে এখন প্রশান্ত বলি না, বলি অশান্ত মহাসাগর।

পঁচিশ তিরিশ বছর আগে যাঁরা এ অঞ্চলে ঘুরে গেছেন তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারবেন না—একটা বিশাল জনপদ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এভাবে সমুদ্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। পুরো মহাপ্লাবন না হলেও এটা যে খণ্ড মহাপ্লাবনের ফল তাতেও আর সন্দেহ কি ?

কিন্তু কারণটা কি ? এমন অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সম্ভব হল ?

গত দু বছর যাবৎ বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শেষে কারণটা বার করে ফেলেছেন। সেটাই এবার সংক্ষেপে বলি।

এখন থেকে ২০।২৫ বছর আগে বিজ্ঞানীরা কুমেরু অর্থাৎ অ্যাণ্টার্কটিক মহাদেশ নিয়ে জোর গবেষণা শুরু করেছিলেন। এমন কি ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও দক্ষিণগঙ্গোত্রী নাম দিয়ে একটা গবেষণা-কেন্দ্র বসিয়ে এসেছিলেন সেখানে। বিজ্ঞানীরা যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তাতে বলা যেতে পারে যে গোটা কুমেরু অঞ্চলটা হচ্ছে একটা বরফ ঢাকা মহাদেশ—যার আয়তন গোটা ইয়োরোপ আর আমেরিকা একত্র করলে যত বড় হয় প্রায় তত বড়। কিন্তু মহাদেশ হলেও এর মাটি বা পাথর দেখার উপায় নেই—কারণ গোটা মহাদেশটাই একটা পুরু বরফের চাদরে ঢাকা। কতটা পুরু ? বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, তা কম করে এক মাইল বা ১৬০ কিলোমিটার পুরু তো হবেই। সমস্ত পৃথিবীতে যতটা বরফ জমে আছে তার শতকরা নব্বই ভাগই আছে এখানে।

এখন, উত্তাপ পেলে বরফও গলে যায়। কুমেরুর ঐ বিশাল এক মাইল পুরু বরফ যদি সত্যি কোনদিন গরমে গলে জল হয়ে যায় তা হলে কি হবে ? সেই জল আর তখন কুমেরুর বুকে ধরে রাখা যাবে না—প্রবল স্রোতে তা গড়িয়ে চলবে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের দিকে। যদি সবটা বরফ গলে যায় তা হলে, হিসেব করে দেখা গেছে, সমস্ত পৃথিবীর ডাঙা ২০০ ফুট জলের নীচে তলিয়ে যাবে, যাকে সত্যিই বলা যায় মহাপ্লাবন।

কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয় !

কিন্তু একেবারেই যে নয় তাই বা বলা যায় কি করে ? বাতাসে

কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে বাতাসের উষ্ণতাও বেড়ে যায়। আর, সত্যিই পৃথিবীর বাতাসে, বিশেষ করে মেরু অঞ্চলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, যার ফলে একদিন হয়তো সত্যিই এখানকার সমস্ত বরফ গলে জল হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তবে এ ব্যাপার ঘটতে এখনও কত হাজার বছর যে লাগবে তার ঠিক নেই। ততদিন, কে জানে, মানুষই হয়তো পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে।

কিন্তু—

কিন্তু যদি কোন অস্বাভাবিক কারণে কুমেরুর ওপরকার বাতাস ভীষণ রকম গরম হয়ে ওঠে তা হলে ঐ ভয়ানক ব্যাপারটা এখনই হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়, আর তাই হয়েছিল ১৯৯৯ সালের শেষ দিনটাতে।

পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলি নিজেরা পরমাণু বোমা তৈরী করে যাচ্ছিল আর ছোট ছোট দেশগুলিকে বোঝাচ্ছিল, খবরদার, কেউ পরমাণু বোমা বানাবার চেষ্টা কর না, তা হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা শুনবে কেন? তাই প্রকাশ্যে ভালো মানুষ সেজে লুকিয়ে চুরিয়ে অনেকেই পরমাণু বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা চালাতে শুরু করেছিল এবং পাছে ধরা পড়ে যায় এই ভয়ে সে সব পরীক্ষার জন্য এমন সব দুর্গম জায়গা বেছে নিয়েছিল যার কথা কেউ জানতে পারবে না। এদেরই কোন একটা ছোটখাট দেশের পরমাণু বিজ্ঞানীরা গোপনে কুমেরুর ওপর উঠে সেখানে একটা পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন।

আর, পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে কি হয় তা তো সবাই জানে। মুহূর্তে আবহাওয়ার উষ্ণতা কোটি ডিগ্রী বেড়ে যেতে পারে। আর তাই হয়েছিল কুমেরুর কোন একটা জায়গায়। ফলে সেখান থেকে বিস্তৃত পরিমাণ জমাট বরফ (কত কোটি টন কে জানে!) গরমে গলে জল হয়ে তীব্র স্রোতে বেরিয়ে এসেছিল এবং অনুকূল পরিবেশ পেয়ে ছুটে চলেছিল উত্তর দিকে। সেই বরফ গলা বিরাট

জলরাশি কুমেরুর কাছাকাছি দেশগুলি,—যেমন দক্ষিণ আমেরিকার তলা থেকে শুরু করে প্রায় অর্দ্ধেকটা এবং অস্ট্রেলিয়ারও খানিকটা তলিয়ে দিয়েছে জলের তলায়, আশপাশের কোন দ্বীপকেও রেহাই দেয় নি। ভাগ্যিস, গোটা কুমেরুর বরফ গলাতে পারেনি সেই পরমাণু বোমা, তা হলে আর এ ঘটনার কথা জানাবার জন্য পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকত না।

যে যন্ত্র আকাশে ওড়ে

(রে ব্র্যাডবুরি রচিত 'দ্য ফ্লাইং মেশিন' অবলম্বনে)

চারশ খৃস্টাব্দে সম্রাট ইউয়ান দাপটের সঙ্গে রাজ্যশাসন করেছিলেন চীনের প্রাচীরের পাশে, প্রজারা বড় সুখী ছিল তাঁর রাজত্বে। বর্ষার জলে মাঠ সবুজ হয়ে যেত। ফসল ফলত প্রচুর।

নতুন বছরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহের প্রথম দিনের ভোরবেলা। সম্রাট ইউয়ান আয়েশ করে গরম চায়ে চুমুক দিচ্ছেন, আর হাত-পাখার বাতাস খাচ্ছেন—এমন সময়ে বাগানের লাল আর নীল টালির ওপর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল তাঁর পরিচারক।

'সম্রাট, সম্রাট! অলৌকিক ঘটনা দেখে এলাম!'

'তাতো দেখবেই', বললেন সম্রাট, 'ভোরের বাতাস যখন এত মিষ্টি!'

'না, সম্রাট, না। সত্যিকারের অলৌকিক ব্যাপার।'

'এমন চমৎকার চা পান করাটাও তো একটা অলৌকিক ব্যাপার। এর চাইতে অদ্ভুত কাণ্ড আর হয় নাকি?'

'হয়, হয় সম্রাট। এই মাত্র দেখে এলাম সেই কাণ্ড!'

'কি দেখে এলি, তা আঁচ করতেই পারছি। সূর্য উঠছে। অথবা হয়ত সমুদ্র নীল হয়ে আছে। অপরূপ অলৌকিক কাণ্ড, তাই না?'

'সম্রাট, দেখে এলাম আকাশে উড়ছে একটা লোক!'

হাত-পাখা বন্ধ করলেন সম্রাট, 'কি দেখলি?'

'ডানায় ভর দিয়ে দিব্বি আকাশে উড়ছে একটা লোক।'

'আকাশে উড়ছে?'

'হ্যাঁ, সম্রাট, হ্যাঁ। আকাশ থেকে কে যেন আমাকে হেঁকে ডাকল। মুখ তুলে তাই চেয়েছিলাম। দেখলাম উড়ন্ত ড্রাগনের মত নীল আকাশে উড়ছে একটা লোক।'

'উড়ন্ত ড্রাগনের মত ?'

'কাগজ আর বাঁশ দিয়ে তৈরি ড্রাগন, লাল সূর্য আর সবুজ ঘাসের মত রঙিন।'

'স্বপ্ন দেখেছিস—ভোরের স্বপ্ন।'

'যা দেখেছি, তা ভোরের আকাশেই দেখেছি—কিন্তু স্বপ্ন নয়—সত্যি। আপনিও দেখতে পারেন—আসুন না!'

'বোস। চা খা। আকাশে উড়ন্ত মানুষ দেখাটা সোজা কথা নয়। মনকে তৈরি করতে হয়। তুই তো দেখেই ভড়কে গেছিস।'

নীরবে চায়ে চুমুক দিয়ে গেলেন দুজনে।

কাঁহাতক আর চুপচাপ বসে থাকা যায়? অস্থির গলায় বলে উঠল পরিচারক, 'এবার চলুন। দেরি করলে উড়ে যাবে।'

উঠে দাঁড়ালেন, সম্রাট। চোখেমুখে ভাবনার ছাপ। বললেন, 'চ। দেখা তোর অলৌকিক কাণ্ড।'

বাগানে নেমে এলেন দুজনে। বাগান পেরিয়ে সবুজ মাঠ। তারপর ছোট্ট একটা সেতুর ওপর দিয়ে বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে দিয়ে উঠলেন ক্ষুদে পাহাড়ের চুড়োয়।

নীল আকাশের দিকে চোখ তুললেন সম্রাট।

'ওই দেখুন! ওই দেখুন!' কানের কাছে গলার শির তুলে চেঁচিয়ে ওঠে পরিচারক।

দেখতে পেলেন সম্রাট। শুনতেও পেলেন। অনেক উঁচুতে মনের আনন্দে গলা ছেড়ে হাসছে আজব সেই লোকটা। অত উঁচু থেকে হাসির ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে নিচে—কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লোকটাকে।

ঝকঝকে কাগজ আর বাঁশের খোলসে আবৃত তার সারা অঙ্গ। দুপাশে ছড়িয়ে রয়েছে ডানা আর পেছনে ভারি সুন্দর হলুদ রঙের ল্যাজ। দুটোই কাগজ আর বাঁশ দিয়ে তৈরি।

বিশ্বের বৃহত্তম বিহঙ্গর মত অনায়াস ভঙ্গিমায় ভেসে যাচ্ছে বাতাসে। পুরাকালের ড্রাগন যেন নতুন করে দেখা দিয়েছে

বিশ্বের বৃহত্তম বিহঙ্গের মত ভেসে যাচ্ছে বাতাসে

নীল গগনে।

ভোরের মিঠে বাতাসে গা জুড়োতে জুড়োতে বহু উঁচু থেকে সোল্লাসে বললে সে, 'উড়ছি! আমি উড়ছি!'

দু হাত নেড়ে সাড়া দিল খুশি উচ্ছল পরিচারক, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উড়ছ—তুমি উড়ছ!'

সম্রাট ইউয়ান কিন্তু একটুও নড়লেন না, পলকহীন চোখে চেয়ে রইলেন দূর বিস্তৃত চীনের প্রাচীরের দিকে। অনেক দূরের সবুজ পাহাড়ের কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে এই প্রাচীর। যেন পাথরের সাপ। এঁকেবেঁকে রাজকীয় ভঙ্গিমায় এলিয়ে রয়েছে মাঠ বন প্রান্তরের ওপর দিয়ে। যুগ যুগ ধরে অত্যাশ্চর্য এই প্রাচীর আগলে রেখে দিয়েছে গোটা দেশটাকে। হানাদাররা প্রাচীরের ওপাশ থেকেই মুখ চুন করে ফিরে গেছে। প্রাচীরের এপাশে শান্তি বজায় থেকেছে বছরের পর বছর।

সুখ আর শান্তিতে ভরা সেই দেশের দিকে এবার চেয়ে রইলেন সম্রাট। নদী, পাহাড় আর পথের ধারে ধারে অগুন্তি বাড়িতে ঘুম ভাঙছে দেশবাসীর।

পরিচারকের দিকে মুখ ফেরালেন সম্রাট।

বললেন, 'আর কেউ দেখেছে উড়ন্ত এই লোকটাকে?'

হাসিমুখে আকাশের পানে চেয়ে দু হাত নাড়তে নাড়তে বললে পরিচারক, 'শুধু আমিই দেখেছি, সম্রাট। আর কেউ নয়।'

মিনিটখানেক ভোরের আলোয় ভরা সুন্দর আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন সম্রাট।

তারপর বললেন ভরাট গম্ভীর গলায়, 'ওকে বলো নেমে আসতে।'

সঙ্গে সঙ্গে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে পরিচারক, 'ওহে! নেমে এসো! সম্রাট কথা বলবেন তোমার সঙ্গে!'

ঘুরতে ঘুরতে আশ্চর্য ভঙ্গিমায় নামতে লাগল উড়ন্ত মানুষ। সম্রাট সেদিকে না চেয়ে দেখতে লাগলেন, দূরে ক্ষেতের মাঠে দাঁড়িয়ে

রয়েছে একজন চাষী। ভোরবেলাই সে বেরিয়েছে মাঠে লাঙল দিতে। আকাশের বিস্ময়কে সে-ও দেখছে অবাক চোখে।

সম্রাট দেখে নিলেন সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক কোনখানটায়।

নেমে এসেছে উড়ন্ত মানব। কাগজের খসখসানি আর বাঁশের মচমচানি শুনে সেদিকে চোখ ফেরালেন সম্রাট।

বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসে নতশিরে অভিবাদন জানালো সে বৃদ্ধ সম্রাটকে।

বজ্রকণ্ঠে বললেন সম্রাট, 'কি করা হচ্ছিল এতক্ষণ?'

চুপসে গেল লোকটা, 'আকাশে উড়ছিলাম, সম্রাট।'

আবার গর্জে ওঠেন সম্রাট ইউয়ান, 'কি করছিলে?'

'বললাম তো কি করছিলাম', একটু তেড়েমেরেই বলে কাগজ আর বাঁশের খোলসে আবৃত আশ্চর্য মানব।

'উড়ছিলে? আকাশে উড়ছিলে?' বলতে বলতে উড়ুক্কু যন্ত্রের সুন্দর কাগজ আর পাখির পাঁজরের মত মিহি বাঁশে হাত বুলিয়ে নিলেন সম্রাট।

গর্বে বুক ফুলে ওঠে আবিষ্কারকের, 'সুন্দর যন্ত্র, তাই না সম্রাট?'

'বড্ড বেশি সুন্দর।'

'পৃথিবীতে এমন যন্ত্র আর দুটি নেই।'

'এইটেই একমাত্র যন্ত্র?'

'আজ্ঞে।'

'আর কে জানে এ যন্ত্রের খবর?'

'কেউ না। আমার বউকেও বলিনি। বললেই তো ভাববে মাথা বিগড়েছে আমার। ও জানে, ঘুড়ি বানাচ্ছি। রাত থাকতেই ঘুম থেকে উঠে চলে গেছিলাম দূরের ওই পাহাড়টায়। যেই ভোর হলো, বাতাসের জোর বাড়লো—আমি লাফ দিলাম পাহাড়ের মাথা থেকে। সেই থেকে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। কী মজা! কী মজা! আমার বউ কিন্তু কিছু জানে না!'

'ভালই করেছ না জানিয়ে। এসো আমার সঙ্গে।'

আবিষ্কারককে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলেন সম্রাট। প্রাসাদের কাছে যখন পৌঁছলেন, তখন আকাশে সূর্যের তেজ বেড়েছে, ঘাসের সৌরভে চারদিক ভরে উঠেছে।

প্রাসাদের সামনে বাগানে থমকে দাঁড়ালেন সম্রাট। হাতের তালি বাজিয়ে ডাকলেন প্রাসাদ রক্ষীদের।

বললেন, 'ধরো এই লোকটাকে।'

আবিষ্কারকের দু হাত চেপে ধরল রক্ষীরা।

'ডাকো জল্লাদকে', হুকুম দিলেন সম্রাট।

হতভম্ব হয়ে গেছিল আবিষ্কারক। আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল জল্লাদকে ডাকার হুকুম শুনেই—'এ কী কাণ্ড! আমার অপরাধটা কী?'

ব্যঙ্গের সুরে বললেন সম্রাট, 'শোনো কথা! অদ্ভুত যন্ত্র বানিয়েছে কেন, তা জানে না। এ যন্ত্র কি কাণ্ড করবে—তাও জানে না।'

ধারালো রুপোর কুঠার নিয়ে দৌড়ে এসেছিল জল্লাদ। মুখে তার সাদা রেশমের পাতলা মুখোশ। পেশীবহুল হাতে কুঠার উঁচিয়ে ধরল আবিষ্কারকের ঘাড় লক্ষ্য ক'রে।

'সবুর!' বলে নিজের তৈরি ক্ষুদে মেশিনটার দিকে চোখ ফেরালেন সম্রাট। গলার হার থেকে বাগানের চাবি টেনে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন সূক্ষ্ম যন্ত্রের ফোকরে! দম দিতেই চালু হয়ে গেল যন্ত্র।

আশ্চর্য যন্ত্র সন্দেহ নেই। ধাতু আর রত্ন দিয়ে গড়া অভিনব এক বাগান। মায়াকানন বললেই চলে। এতটুকু মেশিনের নিখুঁত এক ক্ষুদে বাগান। দম দেওয়া মেশিন চলছে। উপচে উঠছে বাগানের সৌন্দর্য। পুঁচকে পুঁচকে ধাতুর গাছে বসে ভারি মিষ্টি গান গাইছে রঙবেরঙের পাখি, ছোট্ট অরণ্যের মধ্যে থেকে নেকড়ের দল বেরিয়ে এসেই আবার সেঁধিয়ে যাচ্ছে অরণ্যেই, ক্ষুদে মানুষরা দৌড়োদৌড়ি করছে রোদে আর ছায়ায়, এতটুকু হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে নিজেদের, ছোট্ট মরকত পক্ষীদের কুজন শুনছে, অসম্ভব ছোট্ট ঝিরিঝিরি ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে জলের নাচ দেখছে।

বিমুগ্ধ চোখে অপরূপ সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে যেন আপন মনে বলে গেলেন সম্রাট, 'এই হল আমার সৃষ্টি। সত্যিকারের সুন্দর সৃষ্টি। আমি পাখিদের দিয়ে গান গাওয়াচ্ছি। অরণ্যের মর্মর ধ্বনি শোনাচ্ছি। মানুষের কানে পত্র মর্মর আর পক্ষিরব পৌঁছে দিচ্ছি, বনের ছায়ায়, রোদের মায়ায় আর ঝর্ণার ছন্দে তাদের মন আর শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছি। এর চেয়ে সুন্দর সৃষ্টি আর হয় না।'

কেঁদে ফেলে আবিষ্কারক। বসে পড়ে হাঁটু গেড়ে। দু হাত জোড় করে কান্নাজড়ানো গলায় বলে, 'মহারাজ, আমিও কি তাই করিনি? আমিও তো সৌন্দর্যকে খুঁজে পেয়েছি। ভোরের বাতাসে মনের সুখে উঠে বেরিয়েছি। উড়তে উড়তে দেখেছি অনেক নিচুতে ঘুমন্ত বাগান আর বাড়িঘরদোর, সমুদ্রের সৌরভ মাতাল করেছে আমার মনকে—পাহাড়ের ওপাশে নীল উদার সমুদ্রকে দেখতেও পেয়েছি। পাখির মত উড়েছি, মহারাজ। সে যে কি আনন্দ, তা আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না। বাতাস বয়ে যাচ্ছে কানের পাশ দিয়ে হু-হু করে—আকাশের গায়েও যেন মিঠে গন্ধ—পালকের মত হাওয়া আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে দিকে খুশি। মুক্তি! মুক্তি! মহারাজ—কোথাও কোন বন্ধন নেই। এর চাইতে বড় সৌন্দর্য আর হয় না—কখনও হয়নি!'

বিষাদ ঘনিয়ে আসে সম্রাটের দুই চোখে। বলেন বিষণ্ণ কণ্ঠে, 'জানি, জানি, জানি!' স্বাধীন পাখির মত আকাশে উড়তে ইচ্ছে যায় আমারও। দেখতে ইচ্ছে যায় অত উঁচু থেকে কিরকম দেখায় মাটির পৃথিবীকে। কত ছোট দেখায় আমার এই প্রাসাদ আর লোকজনকে? পিঁপড়ের মত? দেখা যায় দূরের শহরগুলোকে? আকাশে ওড়ার আনন্দ পেতে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু—'

'তাহলে ছেড়ে দিন আমাকে!'

'কিন্তু', আরও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে সম্রাটের কণ্ঠস্বর, 'অনেক সময়ে অনেক ছোট্ট সৌন্দর্যকে হারিয়ে যেতে দেওয়াই ভাল—যাতে যে ছোট্ট সৌন্দর্যগুলো আগে থেকেই রয়েছে, সেগুলো টিঁকে থাকে।

ভয় তোমাকে নয়—ভয় আর একটা লোককে।'

'আর একটা লোককে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটা লোককে—যে তোমার দেখাদেখি বানাবে হুবহু এই রকমই একটা যন্ত্র—কাগজ আর বাঁশ দিয়ে। কিন্তু অন্তরে থাকবে বিষ, ইচ্ছায় অশুভ বাসনা—তখন আর এই যন্ত্রকে সৌন্দর্য আবিষ্কারের জন্যে সে কাজে লাগাবে না। আমার ভয় ঠিক এই ধরনের লোকটাকেই।'

'কেন? কেন?'

'কে জানে, একদিন যখন এই যন্ত্র আকাশে উড়ে চীনের প্রাচীরের ওপর বড় বড় পাথর ফেলবে শূন্য থেকে—সেদিন সেই যন্ত্রের চালক হবে বদ্‌বুদ্ধি এই লোকটাই?'

নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন সম্রাট। উপস্থিত সবাই নীরব। নিথর।

গলা চড়িয়ে হুকুম দিলেন সম্রাট, 'গলা দুখানা করে দাও—মুণ্ডটা ধড় থেকে আলাদা করে দাও।'

নিমেষে ঝলকিত হল জল্লাদের রুপোর কুঠার।

জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন সম্রাট, 'ঘুড়ি আর আবিষ্কারকের দেহ পুড়িয়ে ফ্যালো। মাটির নিচে পুঁতে দাও সব ছাই।'

হুকুম তামিল করতে ছুটল লোকজন।

আবিষ্কারককে উড়তে দেখেছিল যে পরিচারক, তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন সম্রাট ইউয়ান।

বললেন শীতল স্বরে, 'ধরে নাও স্বপ্ন দেখেছ সকালে! নিছক স্বপ্ন—সত্যি নয়। ওই যে চাষী দাঁড়িয়ে আছে মাঠে—ওকেও বলে দাও—যা দেখেছে, তা যেন স্বপ্ন বলেই মনে হয় ওর কাছে। সত্যি কথা যদি কাউকে কখনো বলো—তোমার আর ওই চাষীর মাথা লুটিয়ে পড়বে ধুলোয়।'

'অসীম কৃপা আপনার!'

'কৃপা? না, না, তা নয়', কালো ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন সম্রাট। ঘুড়ি আর মৃতদেহ পোড়াচ্ছে রক্ষীরা। পাশে

গর্ত খুঁড়ছে ছাই পুঁতে ফেলবে বলে, 'একজনের মন রাখতে গিয়ে লক্ষ জনের বিপদ ডেকে আনতে আমি পারি না। কক্ষনো না, কক্ষনো না!'

গলায় ঝোলানো হার থেকে চাবিটা আবার টেনে নামালেন সম্রাট, আবার চালু করলেন ক্ষুদে বাগানকে, আবার শুনলেন পাখিদের আশ্চর্য সুরেলা গান, আবার দেখলেন জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুদে নেকড়ে আর পুঁচকে মানুষদের ছুটোছুটি।

চীনের প্রাচীরের এপাশে তখন মানুষজনের ঘুম ভেঙেছে। সবুজ মাঠ, নদী আর প্রশান্ত শহরের দিকে পলকহীন চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে পাঁজর খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সম্রাট ইউয়ান।

পাখিদের পিন্‌পিনে কিচিরমিচির শব্দে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

যন্ত্রের বাগানে একদল রত্নময় পাখি অজস্র রঙের রামধনু ছড়িয়ে ডানা মেলে উড়ে পড়েছে আকাশে।

'পাখি! পাখি! উড়ছে পাখিরা!' খুশিতে ফেটে পড়লেন বৃদ্ধ সম্রাট ইউয়ান।

ভূতুড়ে কুকুর

প্রথম ঘটনাটা ঘটে মাঝরাতে।

চন্দ্রপুর গ্রামের মাথার ওপর ঝকঝক করছিল পূর্ণচন্দ্র। আশ্চর্য স্নিগ্ধ কিরণ ঝরে পড়ছিল মাঠঘাট কুঁড়ের ওপর।

নাতনিকে নিয়ে দাওয়ায় বেরিয়েছিল বুড়ি সৌদামিনী। আর বক বক করছিল সমানে।

'মরণ আর কি! ছচোখের পাতা এক করতে না করতেই ঠাম্মা, ঠাম্মা; কেন, তোর মা কি ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল?'

নাতনি টেঁপির সেদিকে কান ছিল না। ঘুমজড়িত চোখে শিশু-সুলভ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে ছিল বিচিত্র সুন্দর চাঁদের দিকে।

এমন সময়ে দেখা গেল সেই ছায়াটা।

'ঠাম্মা, ঠাম্মা, দেখ, দেখ কি রকম পাখি!'

চোখ তুলে তাকিয়েছিল সৌদামিনী। প্রথমটা কিচ্ছু বুঝতে পারেনি। কাঁঠালগাছের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ওদিকে চলে যাচ্ছে—একটা অদ্ভুত ছায়া। পেছনে মস্ত থালার ওপর চাঁদের বুকে দুষ্ট প্রেতাত্মার মতই মনে হল সে ছায়া। কেননা, তা নিশাচর পাখি নয়। পৃথিবীর কোনো পাখিকেই ওরকম দেখতে হয় না। চাঁদ পেছনে থাকায় স্পষ্ট দেখা গেলেও সৌদামিনীর মনে হল একটা কুকুর বা শিয়ালের মত জানোয়ার শূন্য পথে নিরাবলম্ব ভাবে ভাসতে ভাসতে নেমে গেল কাঁঠাল-গাছের ওপাশে।

দেখেই চোখ কপালে উঠল সৌদামিনীর। বিকট বেসুরো গলায় একবার মাত্র চিৎকার করে উঠেই টেঁপিকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

দিনকয়েক পরের ঘটনা।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল গৌরহরিবাবুর। দাবার নেশা

এমন নেশা যে খেলা জমে গেলে কোন জ্ঞান আর থাকে না। তখন সাইরেন বাজলেও খেয়াল থাকে না। তবে মনটা আজকে প্রসন্ন আছে গৌরহরিবাবুর। বহুদিন বাদে আজ মিত্তিরমশাইকে বড়ের টিপুনি দিয়ে জব্দ করা গেছে। এটা কম সাফল্য নয়। দাবা সম্রাট মিত্তির মশাইকে বড়ের টিপুনি কেন, রাজামন্ত্রী দিয়েও কিস্তিমাৎ করা যায় না। কাজেই—

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন গৌরহরিবাবু।

বাঁশঝাড় সামনেই। দুপাশেই বাঁশগুলো দুদিক থেকে এমনভাবে নুয়ে পড়েছে পথের ওপর যে মাথার ওপর আকাশ দেখা যায় না। ঝুপসি অন্ধকারে পথ দেখা না গেলেও গাঁয়ের লোকদের কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু সেদিন একটা বেয়াড়া দৃশ্য চোখে পড়ল গৌরহরিবাবুর।

ঝুপসি অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছিল একজোড়া নীলাভ আগুন। ঠিক যেন দু টুকরো স্ফুলিঙ্গ।

বুকটা দুড় দুড় করে ওঠে গৌরহরিবাবুর। মনকে সাহস দিলেন। ভাবলেন, নিশ্চয় কোনো শিয়াল-টিয়াল হবে। এগুতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে একটা সিটির শব্দ শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠলেন গৌরহরিবাবু।

কেননা জ্বলন্ত আগুন দুটো আচমকা ধাবিত হল শূন্যপথে। হাউইয়ের মত ঝুপসি অন্ধকার ছেড়ে বেরিয়ে এল নীলাভ স্ফুলিঙ্গ দুটো। আকাশের নিচে আসতেই শিহরিত চোখে গৌরহরিবাবু দেখলেন এক অসম্ভব দৃশ্য।

মাথার অন্তত দশহাত ওপর দিয়ে ধীর গতিতে শূন্যে ভর দিয়ে হেঁটে গেল একটা চারপেয়ে জানোয়ার।

চোখ কচলে নিয়ে আবার তাকালেন গৌরহরিবাবু।

না, ভুল হয়নি। চতুষ্পদই বটে। একটা পেল্লায় কুকুর।

এরপর যে কোনো ভদ্রসন্তানেরই মূর্চ্ছা যাওয়া উচিত অথবা বায়ু বেগে অন্তর্ধান করা উচিত। সাহসী পুরুষ গৌরহরিবাবু শেষোক্ত

আকাশের নিচে আসতেই গৌরহরিবাবু দেখলেন এক অসম্ভব দৃশ্য

পন্থাই অবলম্বন করলেন।

পরদিন সকালে প্রফেসর কেষ্টকানাই পতিতুণ্ডির বাড়িতে হাজির হলেন গৌরহরিবাবু।

প্রফেসর তক্তপোষে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। গৌরহরিবাবুর পদশব্দে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠলেন, 'কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! ভোর না হতেই ব্রাহ্মণ দর্শন!'

গৌরহরিবাবু সন্দিগ্ধভাবে এদিকওদিক তাকিয়ে বললেন, 'প্রফেসর! তোমার কুকুরটা কোথায়?'

চমকিয়ে গিয়ে কেষ্টকানাই বললেন, 'কুকুর! সে আছে। কিন্তু তোমার খবর কি?'

'আছে মানে? বেঁচে আছে তো?'

'বেঁচে থাকবে না তো কি মরে থাকবে?' কেষ্টকানাই এবার একটু বিরক্ত।

গৌরহরিবাবু বললেন, 'প্রফেসর! কাল রাতে কি তাহলে কুকুরের ভূত দেখলাম?'

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন প্রফেসর, অন্তত গৌরহরিবাবুর মনে হল তাই।

তাড়াতাড়ি বললেন কেষ্টকানাই, 'ভূত দেখেছ মানেটা কি? জলজ্যান্ত কুকুর কি ভূত হতে পারে?'

'উঁহু, আমার ভুল হয় নি। কই তোমার কুকুর?' গৌরহরিবাবু নাছোড়বান্দা।

মুখ দেখে মনে হল এবার একটু ফাঁপড়েই পড়লেন প্রফেসর। আমতা আমতা করে বললেন, 'কুকুর দেখবে? না দেখলে বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ এসো।'

ভেতরের দরজা দিয়ে গৌরহরিবাবুকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এলেন প্রফেসর। বিস্তর যন্ত্রপাতি সাজানো ঘরের এককোণে বাঁধা ছিল কুকুরটা। পিঠের উপর দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা পাট

করা কম্বল।

জ্যান্ত কুকুরই বটে। গৌরহরিবাবু তার অপরিচিত নয়। তাই ল্যাজ নাড়তে নাড়তে জুল জুল করে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে।

চাহনি দেখে যেমন মায়া হল গৌরহরিবাবুর, তেমনি অবাক হলেন তিনি। চাঁদের আলোয় গত রাতে তিন ঠিকই দেখেছিলেন। এরকম বিশেষ জাতের বড় আকারের কুকুর এ তল্লাটে আর দ্বিতীয় নেই। অথচ কালই রাতেই যে অশরীরী প্রেতের মত শূন্যে হেঁটেছিল, আজ দিনের আলোয় সে নিরেট কায়া নিয়েই দাঁড়িয়ে সামনে।

ভাবতে ভাবতে কখন যেন হেঁট হয়ে চতুষ্পদের মাথায় হাত বোলাতে শুরু করেছিলেন গৌরহরিবাবু। হাত বোলাতে বোলাতে এই গরমে পিঠে কম্বল চাপানো দেখে দড়ির গিঁট খুলতে শুরু করেছিলেন। এমন সময়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন প্রফেসর।

'ওকি করছ! ওকি করছ! খুলো না! খুলো না!' কিন্তু তার আগেই ফস্ করে খুলে গেছিল গিঁটটা, কম্বলও খসে পড়েছিল পিঠ থেকে।

প্রফেসরের আকস্মিক চেঁচামেচিতে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন গৌরহরিবাবু। কুকুরটাও লাফিয়ে সামনের দুপা তুলে দিতে চাইল তাঁর কোমরের ওপর।

আর তখনি আবার ঘটল সেই ভয়ানক কাণ্ড!

সাঁ করে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল কুকুরটা। আশ্চর্য ধীর গতিতে গিয়ে ঠেকল কড়িকাঠে। সেখান থেকেই গৌরহরিবাবুর স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনেই ভাসতে ভাসতে আবার নেমে এল ঘরের মেঝেতে।

পিলে চমকে উঠেছিল গৌরহরিবাবুর। নেহাৎ শক্ত হার্ট। নইলে হার্ট ফেল করতেন। কুকুরটা ভূমিস্পর্শ করতেই চট করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিঠের ওপর কম্বল চাপিয়ে আবার দড়ি বেঁধে দিলেন প্রফেসর।

আর, সত্যি সত্যি ভূত দেখার মত দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে

লাগলেন গৌরহরিবাবু। দেখতে দেখতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেল তাঁর কপালে ও মুখে।

কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন প্রফেসর কেষ্টকানাই, 'ভেবেছিলুম কাউকে জানাব না। কিন্তু তোমার গোয়েন্দাগিরির জ্বালায় সব ফাঁস হয়ে গেল। গৌরহরি, আমি এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি, যা পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানীদের মাথা ঘুরিয়ে দেবে।'

গৌরহরিবাবুর শুকনো গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না।

প্রফেসর বলে চললেন, 'পূর্ণিমার রাতে আর কাল রাতে সৌদামিনী আর তুমি এই কুকুরটাকে আকাশে হাঁটতে দেখেছ। কেন জানো? কারণ, কুকুরের ওজন কমে গেছে। আজকাল চর্বি কমিয়ে ওজন কমাবার অনেক ওষুধ বেরোচ্ছে। হার্টের ওপর অযথা চাপ কমাবার জন্যে, হার্টের ব্যারাম যাতে না হয়, তার জন্যে কত দামী দামী দাওয়াই না বেরোচ্ছে। কিন্তু আমি এমন একটা পাঁচন আবিষ্কার করেছি, যার এক দাগ খেলেই যে কেউ পালকের মত হাল্কা হয়ে যাবে। এত হাল্কা হয়ে যাবে যে গঙ্গা ফড়িংয়ের মত লম্বা লাফ তার কাছে ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়াবে।

'কুকুরটাকে সেই পাঁচন খাওয়ানোর পরে এই কাণ্ড ঘটল। হতভাগা একটু লাফালেই আকাশে উড়ে যেত। আর আকাশে হাঁটার আনন্দে ক্রমাগত লাফাত। পূর্ণিমার রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সৌদামিনীকে ভয় দেখিয়েছে। কাল রাতে আমিই ওকে নিয়ে বেরিয়েছিলুম। তোমাকে দেখে পাছে তোমার কাছে দৌড়ে যায়, তাই সিটি দিতেই লাফিয়ে উঠে তোমার মাথার ওপর দিয়ে চলে এল।

'পিঠের ওপর কম্বল চাপিয়ে হতভাগাকে আটকে রেখেছি। ঐ কারণেই তুমি কম্বলটা সরিয়ে নিতেই সমান ভলুমের বাতাসের চাইতে হাল্কা হয়ে গেল ও — আর লাফিয়ে উঠতেই ঠেকলো কড়িকাঠে। যদি মনে করো তো, তোমাকেও এক ডোজ পাঁচন খাইয়ে জ্যান্ত ভূত বানাতে পারি। খরচ খুব কম, কিন্তু উপকারিতার

কথা বলে শেষ করা যাবে না।’

শুনে, টপ করে হাঁ বন্ধ করে ফেললেন গৌরহরিবাবু।

—

কিশোর 'সাহিত্যের' চারজন বরণীয় লেখকের কল্পবিজ্ঞান ভিত্তিক আটটি ছোটগল্পের স্মরণীয় সংকলন 'আজগুবি গল্প' । এই চারজন লেখক হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায়, ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য এবং অদ্রীশ বর্ধন । এই গল্পগুলিতে লেখকের কল্পনা আর বিজ্ঞানের যুক্তি চমৎকার ভাবে মিশে গিয়েছে । তরতরে লেখার গুণে কল্পনাকেও প্রায় বাস্তব মনে হয় । কৌতূহল জাগানো এবং একনিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মত গল্পগুলিতে আছে যেমন প্রাগৈতিহাসিক টির‍্যানোসোরাস বা সাগর দানবের গল্প তেমন আছে সুদূর আন্টার্কটিকায় হঠাৎ বরফ গলে যাওয়া বা কুকুরের হালকা হয়ে আকস্মিকভাবে ছাদে গিয়ে ঠেকা আবার উল্কাপাতের সঙ্গে ডায়েরীর রঙ পালটে যাওয়ার কোন সম্পর্ক আছে কি না তার টানটান কাহিনী ।

ওরিয়েন্ট লংম্যান

Rs 12/-

Bardhan: Aajgubi Galpo

ISBN 0 86131 969 9